বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনায়

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
ড. সেলিনা আক্তার
ফাহমিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৫

গ্রন্থ রচনায় সমন্বয়ক
দিলরুবা আহমেদ
পারভেজ আক্তার
তাহমিনা রহমান

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
বর্ণণস কালার স্ক্যান

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি-গঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবন বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে ষষ্ঠ শ্রেণির **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু নতুন আঙ্গিক ও কৌশলে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সমাজ, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের সার্বিক অবস্থা অর্থাৎ ঐ সময়ের বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞান-চেতনা ইত্যাকার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবে। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনোপযোগী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিচিত্র কাজের আয়োজন রাখা হয়েছে। 'অনুশীলনমূলক কাজ' নামে অনুশীলনের এই অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে। গ্রন্থটিতে বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমার্জন করে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে-যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অনুশীলনমূলক কাজ প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পাঠ	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
এক	সমাজের কথা	১	সমাজের ধারণা	১
		২	মানব জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব	২-৩
		৩	সমকালীন সমাজ ও পরিবেশ	৩-৫
		৪ ও ৫	সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর	৫-৭
		৬ ও ৭	কৃষি, শিল্প ও শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ	৭-১১
দুই	বাংলা ও বাংলার মানুষ	১	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১২-১৪
		২	বাংলাদেশের সাধারণ পরিচয়	১৪-১৫
		৩	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান	১৬-১৭
		৪	বাংলার ভূমির কথা	১৭
		৫	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১৮-২০
তিন	প্রাচীন বাংলা এবং বর্তমান বাংলাদেশের জীবনধারা	১	প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলা	২১
		২	বাংলার মানুষের কথা	২২
		৩	বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা	২২-২৪
		৪	প্রাচীন বাংলার শাসন	২৪-২৬
		৫	প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনধারা	২৬-২৭
		৬	প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন	২৭-২৮
		৭ ও ৮	প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন	২৮-৩৩
চার	রাষ্ট্র ও নাগরিক	১	রাষ্ট্রের ধারণা	৩৪-৩৫
		২	রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ	৩৫-৩৭
		৩	নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণা	৩৭-৩৮
		৪	নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম	৩৮-৪০
		৫	দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা	৪০-৪২
পাঁচ	বিশ্ব-ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ	১	ভৌগোলিক পরিচয়	৪৩-৪৪
		২	এশিয়া মহাদেশের অবস্থান ও আয়তন	৪৪-৪৬
		৩	জনসংখ্যা ও অধিবাসী	৪৬-৪৭
		৪	এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৮-৫০
		৫	পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব	৫০-৫৪
ছয়	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১	অর্থনৈতিক জীবনধারা	৫৫-৫৭
		২	বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ	৫৮-৫৯
		৩	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা	৫৯-৬০
		৪	উন্নয়নের পূর্বশর্ত : দক্ষ জনশক্তি	৬০-৬৩
সাত	শিশুর অধিকার	১	মানবাধিকার নিয়ে কিছু কথা	৬৪
		২	শিশুর অধিকার	৬৫-৬৭
আট	সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ	১	আঞ্চলিক সহযোগিতা	৬৮-৬৯
		২	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য	৬৯-৭২

অধ্যায়-এক

সমাজের কথা

পাঠ- ১ : সমাজের ধারণা

মানুষ একা বাস করতে পারে না। তারা বাস করে দলবদ্ধভাবে। একত্রে বাস করার ফলে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। আদিম মানুষ আহার, বাসস্থান ও নিরাপত্তার জন্যই সমাজবদ্ধভাবে বাস করা শুরু করেছিল। এ রকম মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় মানব সমাজ।

আদিকালে মানুষ ছিল অসহায়। তারা ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রথম থেকেই মানুষ দলবদ্ধ জীবনযাপন করত। ইতিহাসের যাত্রাপথে সমাজ ধীরে ধীরে সরল থেকে জটিলতর রূপ লাভ করে।

সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার। পরিবার থেকে গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতি-গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। এভাবেই ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সমাজের উদ্ভব হয়েছে।

আমরা সবাই পিঁপড়া কিংবা মৌমাছি দেখেছি। এসব পতঙ্গের আচরণ লক্ষ করলে দেখা যাবে এরা সবসময় দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। এরা খাদ্যসংগ্রহ করে সমবেতভাবে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যেও রয়েছে। আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের জন্য মানুষও দলবদ্ধভাবে বাস করে। এভাবেই পরস্পরের সহযোগিতায় মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই মানুষ সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেছিল।

খাদ্যসংগ্রহ ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আদিম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করা শুরু করে। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদ থেকে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে সমাজ। ঐক্য, বন্ধুত্ব ও সংঘবদ্ধতা সমাজের মূল ভিত্তি। তবে পিঁপড়া ও মৌমাছির মতো মানুষের প্রকৃতি সরল নয়। তার আচরণ বেশ জটিল। এজন্য মানুষের সমাজে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সঙ্গে রয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও বিরোধ। এই সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা, বন্ধুত্ব ও বিরোধ নিয়েই মানুষ দলবদ্ধভাবে সমাজে বাস করে।

সাধারণভাবে সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর প্রথমটি হচ্ছে, মানুষ বাস করে সংঘবদ্ধভাবে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের এই সংঘবদ্ধতার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বা প্রয়োজন থাকে। সুতরাং সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝি, যার ভিত্তিতে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে সমবেতভাবে বসবাস করে।

কাজ-১ : নিজ নিজ পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজের ছক তৈরি কর।
কাজ-২ : দলে ভাগ হয়ে আদিম সমাজের দলবদ্ধ কাজগুলোর অভিনয় কর ও পরে ছবি আঁক।

পাঠ-২ : মানব জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

মানুষের জীবন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। মানুষ কখনো পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্যই মানব সমাজের রূপরীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির উপর পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট।

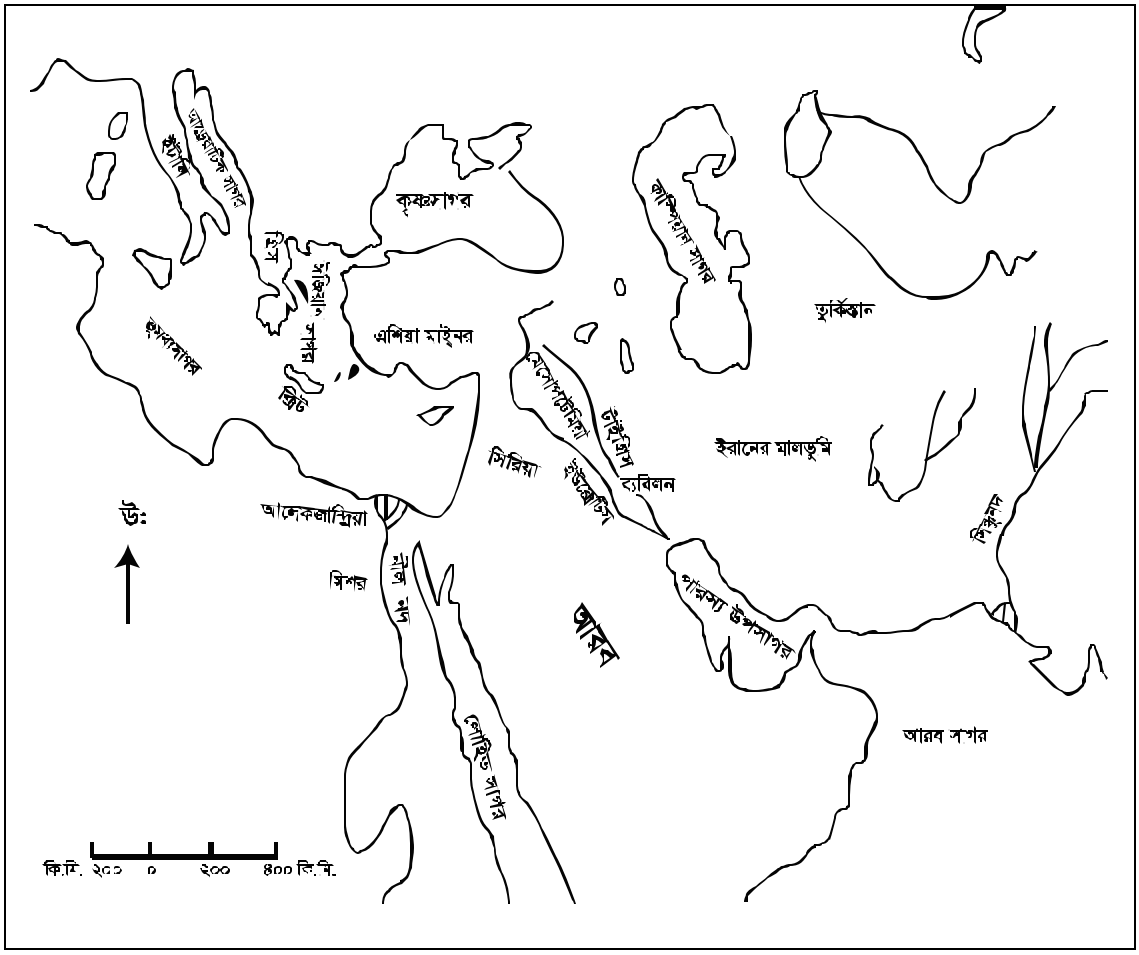

চিত্র ১.১ : মানচিত্রে কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা

মানচিত্রটি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব যে, পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতাই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেসোপটেমীয় সভ্যতা ভৌগোলিক অবস্থার কারণেই বেশিকাল স্থায়ী হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতা ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা গঙ্গা অববাহিকায় বিকাশ লাভ করেছে।

আবার কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পেশা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। যেমন খনি অঞ্চলে খনি-শ্রমিক ও শিল্প এলাকায় শিল্প-শ্রমিক বাস করে। নদীমাতৃক দেশ বলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের যানবাহন হচ্ছে নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার। আবার কোনো কোনো এলাকার যানবাহন রেল, বাস, রিকশা ও গরুর গাড়ি।

কুটিরশিল্প বিকাশেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। নদীবহুল এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ঢাকার ডেমরায় তাঁতিরা বাস করে এবং এখানেই বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ি বোনা হয়। রাজশাহীতে রেশমি শাড়ি ও বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ এ অঞ্চলে তুঁতগাছ জন্মে এবং তুঁতগাছে রেশম কীট বাসা বাঁধে।

ফরিদপুরের খেজুরগুড়, মুক্তাগাছার মণ্ডা, টাঙ্গাইলের শাড়ি, পোড়াবাড়ির চমচম, সিলেটের শীতল পাটি ঐ সব এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁও এর বিখ্যাত মসলিন শিল্পও এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই বিকাশ লাভ করেছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্যও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ গরম পশমি কাপড় পরে আর গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার মানুষ পরে হালকা সুতি কাপড়। যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় সেখানকার মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে কাঠ ব্যবহার করে বেশি। যেসব এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সেখানে সহজেই শিল্পায়ন ঘটে এবং নগর গড়ে উঠে। নৌ-যোগাযোগ ভালো বলে নারায়ণগঞ্জে অনেক আগে থেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কাজ- ১ : মানচিত্রে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : বাংলাদেশের মানচিত্রে শাড়ি, চমচম, শীতলপাটি, রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলো দেখাও।

পাঠ – ৩ : সমকালীন সমাজ ও পরিবেশ

মানুষ ও পরিবেশ

প্রকৃতির চারটি মূল উপাদান হলো মাটি, পানি, বায়ু এবং তাপ। সূর্য থেকে আমরা তাপ এবং আলো পাই। মাটির উপর গাছপালা জন্মেছে পানি, বায়ু, তাপ ও আলোর কারণে। এসবের উপর নির্ভর করেই এ পৃথিবীতে মানুষের বসতি সম্ভব হয়েছে।

মাটির বাড়া-কমা নেই, কিন্তু ক্ষয় আছে, তাতে যে খনিজ সম্পদ থাকে সেগুলো হ্রাস পায়। বাকি তিনটি অর্থাৎ পানি, বাতাস ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, খরায় আমরা এ সমস্যা ভালোই টের পাই।

মানুষ যখন থেকে চাষবাস করে স্থিতবস্থায় এসেছে, তখন থেকেই প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে। বনবাদাড় সাফ করে বড় এলাকা জুড়ে ফসলের ক্ষেত করেছে। ধান, গম, ভুট্টা আরও অনেক ফসল। কিছু পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে। বন্য-পশুর মধ্যে কোনোটিকে মেরে রান্না করে খেতে শিখেছে। আবার কোনোটিকে মেরে হয়তো চামড়াটা কাজে লাগিয়েছে। বাঁচার তাগিদে হিংস্র পশুকে হত্যাও করেছে।

যেভাবে সমস্যা বেড়েছে

মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধি খাটিয়ে নদীতে বাধ দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। পানির শক্তি কাজে লাগিয়ে কল চালিয়েছে এভাবে ক্রমেই তার প্রয়োজন মতো সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছে। বড় বড় কলকারখানা বানিয়েছে, শহর গড়েছে, গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন চলাচ্ছে। শীতাতপ যন্ত্র বানিয়ে নিজের আরাম বাড়িয়েছে। এসব মিলিয়ে নানা রকম শব্দও বাড়ছে। শব্দদূষণও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মানুষ বাড়তে থাকায়, আর সবার মধ্যে ভালো ও আরামে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় পরিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। বলা যায়, মাটি, পানি, বায়ু ও তাপের সাথে মানুষের জীবনযাপনের যে ভারসাম্য থাকা দরকার ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দূষণের কারণে ঢাকা শহরের শতকরা ২৫ ভাগ শিশু শ্বাসকষ্টে ভোগে। তাছাড়া হৃদরোগ, ক্যান্সার, চর্মরোগ, নানা ধরনের অ্যালার্জি বাড়ছে।

একই জমি বারবার চাষ হওয়ার ফলে তার স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে তখন মানুষ তাতে জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক সার দিচ্ছে। সার তৈরি এবং কাপড়, ঔষধ, নানা সরঞ্জামসহ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেড়ে চলেছে কারখানা এগুলো থেকে কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আর যে বর্জ্য বেরিয়ে আসছে তা পানি ও বায়ুকে দূষিত করছে। তাছাড়া এর প্রভাবে তাপমাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। তাপ বেড়ে যাওয়ায় আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়, বন্যা, সুনামি হচ্ছে।

আবার মানুষ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গাছপালা কাটা পড়ছে, প্রাকৃতিক বন উজাড় হচ্ছে। তাতে ভূমিক্ষয় আর তাপবৃদ্ধি ঠেকানো যাচ্ছে না। এমন কি এসবের ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুণি-রশ্মি ঠেকানোর জন্য পৃথিবীর মহাকাশে যে ওজোন স্তর আছে তাতেও ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

ক্রমশ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তাতে সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপসহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আমাদের দায়িত্ব

এরকম সর্বনাশ কি আমরা হতে দিতে পারি? এ নিয়ে জাতিসংঘ থেকে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সবারই, এমনকি শিশুদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা-

- অযথা গাছ কাটব না।
- যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করব না।
- আমরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলব না।
- রাস্তাঘাটে থুথু, সর্দি ফেলব না।
- যেসব গাড়ি কালো-ধোঁয়া ছাড়ে সেগুলো চলাচল বন্ধ করার জন্য সচেতন করব।
- লোকালয়ের কাছে শিল্পকারখানা না গড়তে সচেতন করব।
- বাড়ির বর্জ্য যথাস্থানে ফেলব। নর্দমায় কখনো শক্ত বর্জ্য ফেলব না।
- অযথা মাইক বাজিয়ে শান্তি নষ্ট করব না।
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অফিস এলাকায় শব্দ দূষণ করব না।
- পাহাড় কাটব না।
- নদী, খাল, হ্রদ বা সমুদ্রসহ ছোটবড় কোনো জলাধারে নোংরা ফেলব না।
- বন, পাহাড়, নদীসহ কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করব না।
- গাছ লাগাব ও গাছের যত্ন নেব।
- প্রকৃতির কাছাকাছি থাকব।
- মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণগুলো জানব ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেব।
- উন্নয়নমূলক কাজে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রাখাকে অগ্রাধিকার দেব।
- নিজের খাবার, পোশাক ও অন্যান্য জিনিস নির্বাচন ও ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্যের কথা বিবেচনা করব।

কাজ- ১ : প্রকৃতির মূল উপাদানগুলোকে ভালোভাবে চিনে ও বুঝে নাও।
কাজ- ২ : কীভাবে মানুষ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে তা আলোচনা করে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ কর।

পাঠ- ৪ ও ৫ : সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর

সমাজ পরিবর্তনশীল। আজকের দিনের যে সমাজ আমরা দেখছি, আগের দিনের সমাজ সেরকম ছিল না। আজকের সমাজ দীর্ঘকালের বিকাশধারার ফল। কালে কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পুরনো সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে একালের আধুনিক সমাজ গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমাজ আরও পরিবর্তিত হবে। কালের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সমাজের এই পরিবর্তনকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে :

১. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ,
২. উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজ,
৩. পশুপালনকারী সমাজ,
৪. কৃষিভিত্তিক সমাজ,
৫. শিল্পভিত্তিক সমাজ এবং
৬. শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী সমাজ।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজই হচ্ছে মানব সমাজের আদিমতম রূপ। মানুষ সে সময় গুহা ও বনজঙ্গলে বাস করত। তখন প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু মানুষ তখনও খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। বনজঙ্গল থেকে তারা খাবার খুঁজে নিত আর শিকার করত। খাবারের খোঁজে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

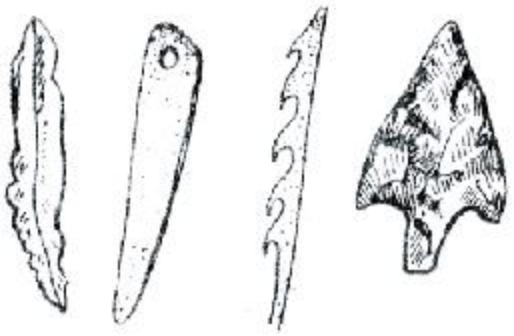

চিত্র ১.২ : আদিম সমাজে খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার

ফলমূলসংগ্রহ, মাছশিকার এবং পশুপাখি শিকারই ছিল আদিম সমাজের প্রধান কাজ। মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত আর পুরুষরা শিকার করত। গোষ্ঠীর শক্তিশালী লোকটিকে সবাই দলপতি হিসেবে মানত।

আদিম মানুষ পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা শিখেছিল। তাদের হাতিয়ার ছিল খাঁজকাটা বল্লম, মাছ ধরার হারপুন এবং হাড়ের সুঁই। শীত ও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গাছের ছাল ও লতাপাতা এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করত।

উদ্যানকৃষিভিত্তিক সমাজ

খাদ্য সংগ্রহকারী ও শিকারি মানুষ ধীরে ধীরে খাদ্য উৎপাদন করা শিখেছে। উদ্যানকৃষি ও পশুপালনকারী সমাজই প্রথম খাদ্য উৎপাদন শুরু করে। পাথরের হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে মানুষ বীজ বুনে শুরু করে চাষবাদ।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, মেয়েরাই কৃষিকাজ উদ্ভাবন করেছে। খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা আনতো বুনো গম ও বার্লি, আলু, কচুর মূল ও কন্দ। তাদের থাকার জায়গার পাশে গম ও বার্লিদানা পড়ে গজিয়ে উঠত চারাগাছ। এই ঘটনা দেখেই মেয়েদের মনে বীজ ছিটিয়ে শস্য পাওয়ার ধারণা জন্মে। মেয়েরা জমিতে পাথরের হাতিয়ার দিয়ে গর্ত করে বীজ বুনত।

এ সমাজের যন্ত্রপাতি ছিল পাথর আর কাঠের তৈরি। এরাই মৃৎশিল্প, চামড়াশিল্প ও তাঁতশিল্পের জন্ম দিয়েছে। তবে প্রয়োজনের বেশি ফসল এরা উৎপাদন করেনি।

পশুপালনকারী সমাজ

উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজ বিকশিত হয়ে পশুপালনকারী সমাজে পরিণত হয়। পশুপালনকারী সমাজের বিকাশ ঘটে ২০,০০০ বছর আগে। এরাই বন্যপশুকে পোষ মানিয়েছে। এ সমাজে এক বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। এই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে ছিল তৃণভূমি, মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের সেই অঞ্চল যেখানে প্রচুর ঘাস জন্মাত। এ সমাজের মানুষ, গরু-ছাগল, ভেড়া, উট ও বন্যা হরিণকে পোষ মানাতে শুরু করে। এরা পশুর খাদ্যের জন্য তৃণভূমির সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

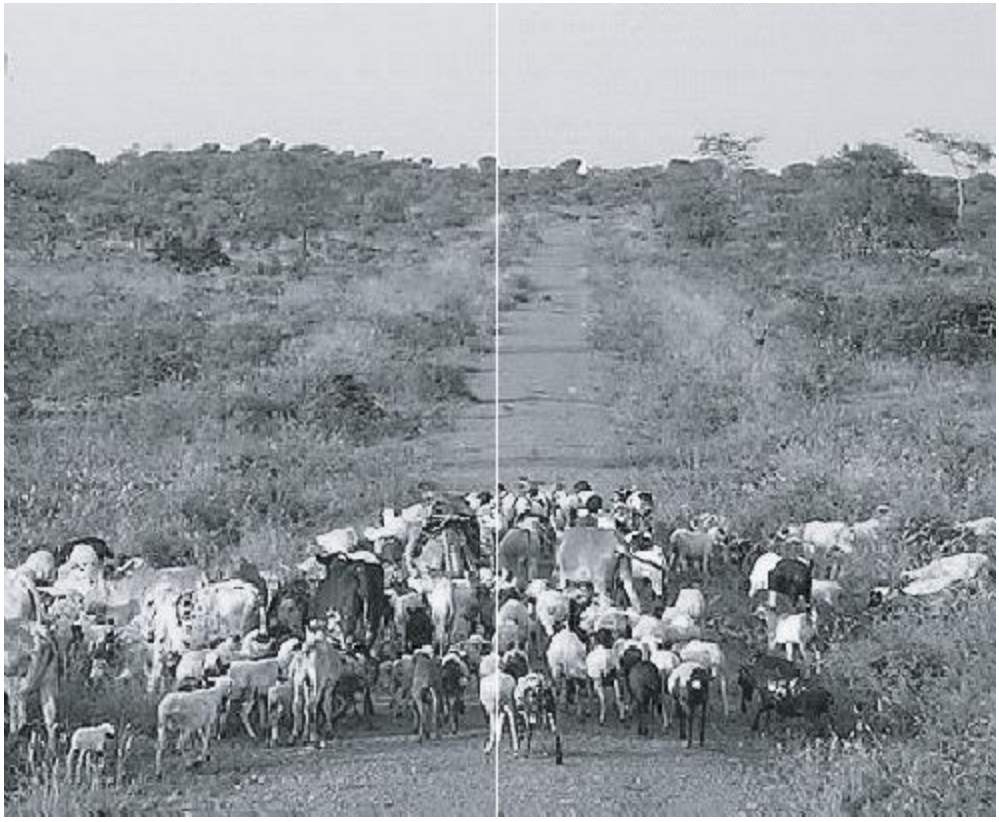

চিত্র ১.৩ : পশুপালনকারী সমাজে পশুপালন

পশুপালনকারী সমাজ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য উৎপাদন করত। বিনিময় প্রথা এরাই আবিষ্কার করে। একজনের পশুর সঙ্গে অন্যজনের পশু কিংবা অন্য কিছু বদল করা হতো। উদ্যানকৃষিভিত্তিক সমাজ ও পশুপালনকারী সমাজ প্রায় একই কালের বলে মনে করা হয়। বিশাল পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয়তো একই কালে এ দুটো সমাজের বিকাশ হয়েছিল।

কাজ- : তিন দলে ভাগ হয়ে উপরে বর্ণিত তিনটি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে লেখ ও সবাই মিলে বড় আকারের ছবি আঁক

পাঠ- ৬ ও ৭ : কৃষি, শিল্প ও শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী সমাজ

কৃষিভিত্তিক সমাজ

সমাজ বিকাশের যে স্তরে মানুষ লাঙল উদ্ভাবন করে সে স্তরকে কৃষিভিত্তিক সমাজ বলা হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজের সূচনা ১২,০০০ বছর আগে। এ সমাজের প্রথম দিকে মানুষ লাঙল ব্যবহার করেনি। লাঠির মতো হাতলের সঙ্গে পাথরের ফলক-বাঁধা একরকম কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে তখন জমি চাষ হতো। লাঙল তৈরি হয় আরও পরে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে। ধীরে ধীরে কৃষিতে হালের বলদ ব্যবহার শুরু হয়।

এর ফলে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে। কৃষির শুরুতে লাঙলের ফলা ছিল কাঠের। পরে পাথরের ফলা জুড়ে উন্নত চাষ শুরু হয়।

চিত্র ১.৪ : কৃষিভিত্তিক সমাজে লাঙলের সাহায্যে চাষ

কৃষিকাজ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশকে গতিশীল করেছে। এ সমাজের মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কৃষি-সভ্যতায় লিখিত ভাষার ব্যবহার শুরু হয়, নগর গড়ে উঠে এবং মানুষ সামরিক পেশা গ্রহণ করে। এ সময় পরিবার গড়ে উঠে এবং বিয়ের প্রথা শুরু হয়। এসব কারণেই কৃষিকে সভ্যতার সোপান বলা হয়। উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও বিনিময় এইসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষিসমাজেই শুরু হয়।

শিল্পভিত্তিক সমাজ

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে যায়। ইউরোপের মানুষ আবিষ্কার করে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। এটি ইউরোপের নবজাগৃতি ও রেনেসাঁস নামে পরিচিত। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ বেরিয়ে পড়ল অজানাকে জানতে, পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়। ১৬৮৫ সালে

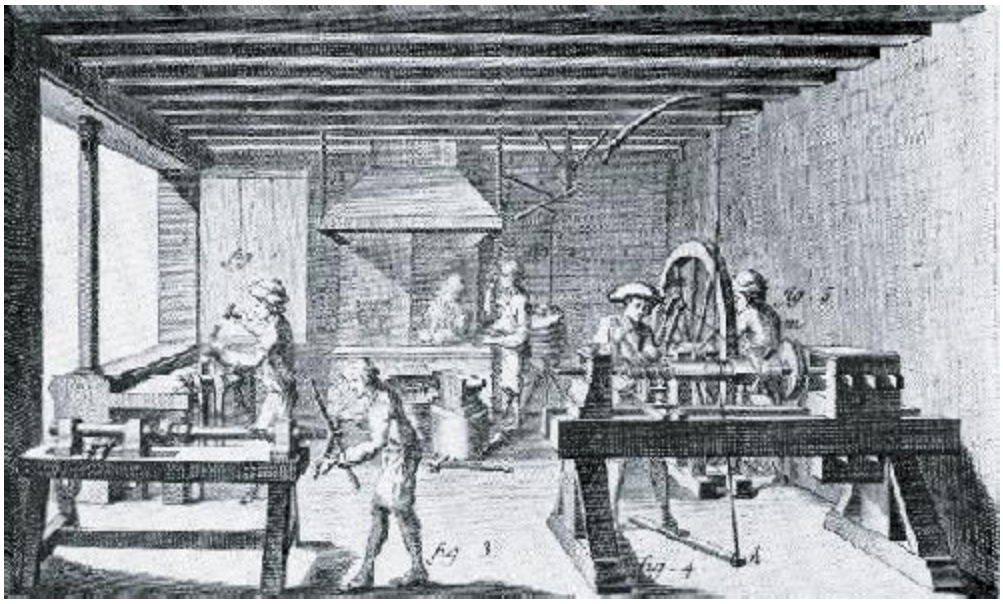

চিত্র ১.৫ : শিল্পভিত্তিক সমাজে যন্ত্রচালিত উৎপাদন

নিউটন তুলে ধরলেন তার যুগান্তকারী আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। এভাবে শুরু হলো একের পর এক নানা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধারণা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা পরপর আবিষ্কার করেন সুতা কাটার মাকু বা স্পিনিং মেশিন, যান্ত্রিক তাঁত, বাষ্পচালিত জাহাজ ও রেলের ইঞ্জিন। এ সময় বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়। আর স্টিম টারবাইন নামে বিশেষ ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এভাবে একদিকে বড় বড় শিল্পকারখানায় উৎপাদন শুরু হয় আর অন্যদিকে দ্রুতগামী জাহাজ ও রেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের বিস্তার ঘটে। এভাবেই সূচনা হয় শিল্পবিপ্লবের। শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল ইউরোপে, পথিকৃৎ ছিল ইংল্যান্ড।

আঠারো-উনিশ শতকে কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল ও বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। উনিশ শতকে রেল যোগাযোগ চালু হয়। তখন থেকে বিশ্বব্যাপী শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে। বিশ শতকে শুরু হয় বিমান, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশনের ব্যবহার।

শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী সমাজ

শিল্পভিত্তিক সমাজে শক্তির উৎস হিসেবে মানুষ ও পশুর স্থান দখল করে যন্ত্র। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য। শিল্পের বদলে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করাই হচ্ছে অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। সম্পত্তির মালিকদের বদলে পেশাজীবী, চাকরিজীবী, বিজ্ঞানী, তথ্য প্রকৌশলী এবং সেবা ও বিনোদন খাতের সাথে যুক্ত মানুষেরাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন এবং যোগাযোগের নানা মাধ্যম যেমন, ফেসবুক পৃথিবীর মানুষকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বলা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন।

কাজ : কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা বিতর্ক করবে এবং দেয়াল পত্রিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. গোত্র গ. সম্প্রদায়
খ. গোষ্ঠী ঘ. পরিবার

২. নারীই প্রথম কৃষি কাজ শুরু করেন, কারণ তাদের ছিল-

i. সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি
ii. খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব পালন
iii. দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও ii
খ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

স্কুল মাঠে একটি মেলা হচ্ছে। একটি স্টল স্পিনিং মেশিন, কাপড় বুননের তাঁত, বিদ্যুৎ তৈরির ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে।

৩. অনুচ্ছেদে স্টলটিতে কোন সমাজের নিদর্শন রয়েছে?

ক. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক গ. কৃষিভিত্তিক
খ. উদ্যানকৃষিভিত্তিক ঘ. শিল্পভিত্তিক

৪. উক্ত সমাজ ব্যবস্থার ফলে –

i. অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে
ii. কৃষির সূচনা হয়েছে
iii. যোগাযোগ সহজতর হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও iii
খ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

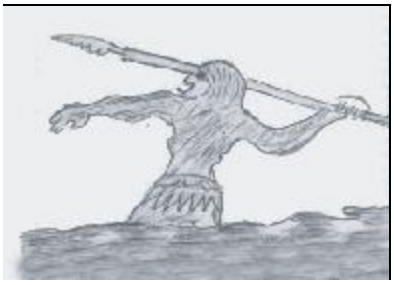

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পোড়াবাড়ি কিসের জন্য বিখ্যাত ?
খ. আদিম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করত কেন ?
গ. উদ্দীপকে ১নং চিত্রটি কোন সমাজের ইঙ্গিত বহন করছে, ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ২ নং চিত্রে ইঙ্গিতকারী সমাজের উদ্ভাবক মেয়েরাই-বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর

২. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির হোসেন ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। বাড়িতে ব্যবহার করেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র । তার ছেলে-মেয়েরা বিনোদনের জন্য উচ্চ আওয়াজে গান শোনে, যা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। তার এপার্টমেন্ট ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রয়েছে নিজস্ব জেনারেটর

ক. মানুষ কখন থেকে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে ?

খ. প্রকৃতির মূল উপাদান কীভাবে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে ?

গ. মনির হোসেনের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পরিবেশে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে ? বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তোমার কি কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

অধ্যায়-দুই

বাংলা ও বাংলার মানুষ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আজকের বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল। কিন্তু সেদেশের মানুষ আমরা কেবল বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার হয়েছি। অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। তারই ফসল আমাদের এই বাংলাদেশ। বহু মানুষের ত্যাগ ও বীরত্বের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। জাতি অর্জন করেছে বিজয়। ইতিহাসে আমরা পরিচিত হয়েছি বীর বাঙালি ও বিজয়ী জাতি হিসেবে।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। সে বছর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন আর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। মার্চ থেকে ডিসেম্বর–এই নয় মাস এই দেশ পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে ছিল। আর বাঙালি

চিত্র ২.১ : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে। কিন্তু এত বড় ঘটনা তো আর হঠাৎ করে শুরু হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এরও একটি পটভূমি ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন থেকেই বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিহাসের শুরু। দেশটি ছিল দুই অংশে বিভক্ত–পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় বার শ' মাইলের ব্যবধান। মাঝখানের দেশটি ভারত। পাকিস্তানের রাজধানী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, ক্ষমতাও ছিল তাদের হাতে। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে শাসকরা ছিল বিভ্রান্ত। তবে বাঙালিদের বঞ্চনা ও শোষণের ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকদের কোনো দ্বিধা ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথম আঘাতটা এলো মাতৃভাষা বাংলার উপর। তারপর এলো রাজনৈতিক অধিকারের উপর। একতরফা ক্ষমতা ভোগ করে পাকিস্তানি শাসকরা আঘাত হানল আমাদের অর্থনীতির উপর। পাশাপাশি চলল বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা আর তা ধ্বংসের প্রয়াস। এ অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবে এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এক সাহসী, ত্যাগী ও দূরদর্শী নেতার আবির্ভাব না হলে কিছুই করা যেত না। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। উজ্জীবিত জাতি ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায়। কিন্তু সামরিক সরকার এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে বাংলার রাজনীতিবিদ ও ছাত্র জনতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপসহীন অবস্থান নেয়।

হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও আমাদের বিজয়

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে ভারী অস্ত্র আর ট্যাংকবহর নিয়ে ঘুমন্ত মানুষের উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় তাদের। গভীর রাতে তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। তবে তার আগে বঙ্গবন্ধু কেতারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি বার্তা সারা দেশে পাঠিয়ে দেন। এদিকে বাঙালি সেনা ও জনতা দ্রুত সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রাজনীতিবিদ ও দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ সংগঠিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসন চালু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক দেশ এই দুঃসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এক কোটি মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞে এদেশের ত্রিশ লক্ষ

মানুষ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল। অসংখ্য ঘরবাড়ি, জনপদ, লোকালয়, গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এত ত্যাগ এত ক্ষতি স্বীকার করেই আমরা ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি। এই দিনটি আমরা বিজয় দিবস হিসেবে পালন করি। সেদিন তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

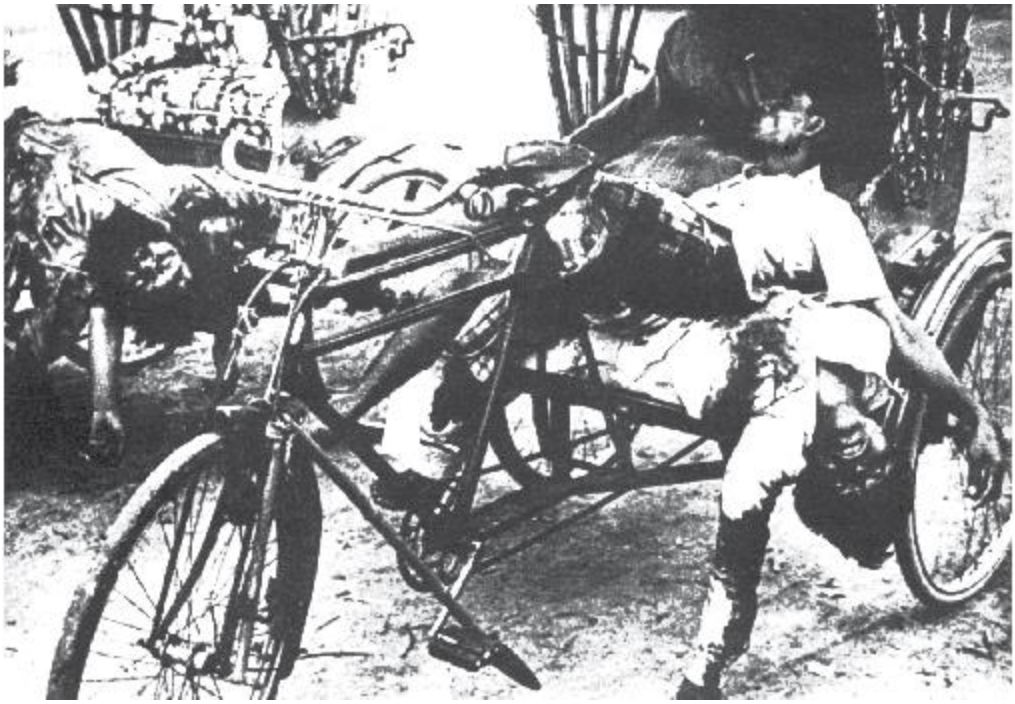

চিত্র ২.২ : ২৫শে মার্চ কালরাত্রির গণহত্যা

হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি প্রথম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করল। তাই বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক এবং এ রাষ্ট্রের স্থপতি।

স্বাধীনতার একদিকে রয়েছে অনেক হারানোর বেদনা, অন্যদিকে বিশাল প্রাপ্তির আনন্দ। রক্তেভেজা স্বাধীনতার লালসূর্য আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলসুন্দর দেশের উপর

কাজ-১ : স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণগুলো ক্লাসে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-২ : স্বাধীনতা যুদ্ধে কেন আমরা বিজয়ী হয়েছি তা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে ক্রমানুসারে সাজাও।
কাজ-৩ : মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম বানাও।

পাঠ–২ : বাংলাদেশের সাধারণ পরিচয়

বাংলাদেশকে কবি বলেছেন রূপসী বাংলা। অনেক নদী-খাল-বিলে সমৃদ্ধ এই দেশের মাটি খুবই উর্বর তাই তো দেশের প্রকৃতি সবুজে-শ্যামলে এত চোখ জুড়ানো। কবি যখন গ্রামগুলোকে ছবির মতন বলেন তখন একটুও বাড়িয়ে বলেন না। নদী আর খাল, দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত ও হাওর, সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা

গ্রাম ও জনপদ দেশের অপরূপ শোভা তুলে ধরে। আর বছরে ছয় ঋতু এই সমৃদ্ধ প্রকৃতির রূপে কত না বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলে। কবি কি এমনি এমনি বলেছেন–"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!"

চিত্র ২.৩ : বাংলাদেশের নৈসর্গিক দৃশ্য

আমাদের এই দেশটি নদীমাতৃক, গ্রামভিত্তিক এবং কৃষি প্রধান দেশ। ছয় ঋতুর দেশ হলেও এদেশে বর্ষাই অন্যতম প্রধান ঋতু। অধিকাংশ মানুষ সরল, আর সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত তারা পরিশ্রমী, আবার গান-বাজনা কাব্যকথকতায় আনন্দ পায়। এখানে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বরাবর ছিল নিবিড়।

চিত্র ২.৪ : হিউয়েন সাঙ

বিভিন্ন সময়ে নানা দেশ থেকে অনেকেই জ্ঞানচর্চার জন্য বাংলায় এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ। তিনি ৬৩৯ সালে লেখেন– "এখানে সর্বত্র প্রচুর শস্য আর ফলমূল জন্মায়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ আর লোকেদের স্বভাব ভদ্র। এখানকার মানুষ পরিশ্রমী। এরা বিদ্যানুরাগী।"

কাজ-১ : রূপসী বাংলার একটি ছবি আঁক
কাজ-২ : শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক বাংলার রূপ বর্ণনামূলক ৮ লাইনের কবিতা বা গল্প লিখুন।
কাজ-৩ : চীনা ভিক্ষুর নাম কী? তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৭১ সাল থেকে। এবার আমরা মানচিত্রে দেশের অবস্থানটা দেখে নিই। মানচিত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ কর। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশের সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে- ১। তারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

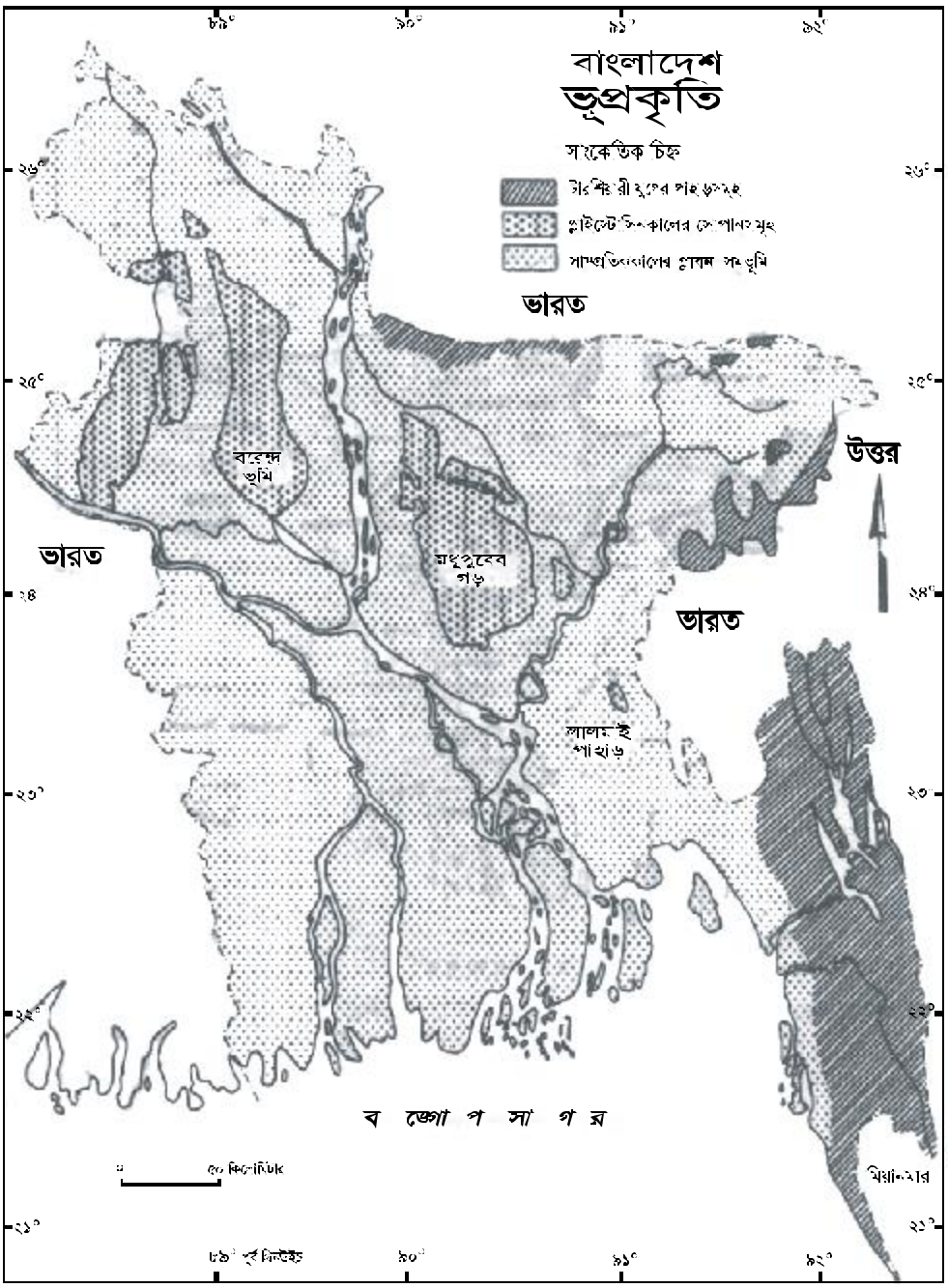

চিত্র ২.৫ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্র

মানচিত্রে আরও লক্ষ করি, বাংলাদেশের প্রায় তিনদিক জুড়ে আছে ভারত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা সীমান্ত আছে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সাথে। দক্ষিণে সমুদ্র–বঙ্গোপসাগর। আমাদের তিনটি প্রধান নদী–পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা। অন্যান্য বড় নদী হলো ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সুরমা, কর্ণফুলি, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি। বেশির ভাগ নদীর উৎস ভারতে। কিছু কিছু নদী আছে যেগুলো বড় নদীর শাখা। দেশের উত্তরের জেলা থেকে অনেক সময় হিমালয়ের শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

কাজ : মানচিত্র এঁকে তাতে প্রধান তিনটি নদী দেখাও।

পাঠ-৪ : বাংলার ভূমির কথা

আমরা সবাই জানি, নদীর পলি দিয়েই গঠিত হয়েছে এদেশের ভূমি। মূলত পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র আর তাদের শাখাগুলোই উজান থেকে পলি বয়ে এনেছে। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে পলি জমে জমে এখানে জমি সৃষ্টি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। খুব বেশিদিন হবে না এভাবেই নিঝুম দ্বীপ সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছে। মনে রাখতে হবে আমাদের নদীগুলো বর্ষায় ফুলেফেঁপে প্রায়ই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। যেমন তারা পলি বয়ে এনে জমি তৈরি করে তেমনি পুরনো অংশে ভাঙন চালিয়ে যায়। পদ্মার ভাঙনের তাণ্ডব এত বেশি যে নদীটির আরেক নাম কীর্তিনাশা–মানে যে কীর্তি নষ্ট করে দেয়।

তবে মনে রেখো উত্তরের অঞ্চলগুলো–রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং দক্ষিণ-পূর্বের পার্বত্য চট্টগ্রাম কিন্তু বেশ পুরনো ভূমি। এ ভূমির বয়স কয়েক লক্ষ বছর হবে। তুলনায় ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের অধিকাংশই নতুন ভূমি। দশ হাজার বছর কিংবা তার চেয়ে কম। আরও দক্ষিণে, খুলনার উপকূলে সমুদ্র, নদী আর জমির মধ্যে খুবই সক্রিয় সম্পর্ক। এখানে রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য নদী-খাড়ি-খাল-জলা। এখানেই তটরেখা জুড়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লবণাক্ত ভূমির বন, ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। এখানেই আছে পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বন্যপ্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

চিত্র ২.৬ : ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট

কাজ-১ : নদী-ভাঙনে মানুষের কী ধরনের কষ্ট হয় তা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর।
কাজ-২ : সুন্দরবন নিয়ে প্রকল্প তৈরি কর।

পাঠ – ৫ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা

আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশে মানুষ বেশি। কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা এবং মোট ভূমির পরিমাণের যে অনুপাত তা জনবসতির ঘনত্ব। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনবসতির ঘনত্ব জানতে হলে মোট জনসংখ্যা ও দেশের আয়তন জানতে হবে।

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট ভূমির আয়তন}}$$

বাংলাদেশে ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন মানুষ বাস করে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার জায়গার মধ্যে। ছোট্ট একটা ভাগ করেই জানা যাবে যে দেশে এক বর্গ কিলোমিটারে হাজারেরও বেশি (১০১৫ জন) মানুষ বাস করে। আমাদের চেয়ে অনেক বড় দেশ রাশিয়া ও আমেরিকায় এই সংখ্যা হলো যথাক্রমে ৮.৬৭ (২০১০) ও ৩৪ জন (২০১১)। চীন ও ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হলো যথাক্রমে ১৪৪ ও ৪১০.৭২ জন (২০১১)। তাহলে সহজেই বলা যায় বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি।

চিত্র ২.৭ : জনবহুল স্থান

বুঝা যাচ্ছে আমাদের জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশি। ভূমিতেই আমাদের বাস, জমিতেই আমাদের চাষ। ফলে জনসংখ্যাকে খুব বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাদের। এদিক থেকে জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্ব বুঝে নেওয়া দরকার। জনসংখ্যার বাড়া-কমা, দেশে কোন বয়সের মানুষ বেশি, তাদের বসবাসের ধরন এসব জানা থাকলে জনসংখ্যা পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

বাংলাদেশে ২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩৭ শতাংশ। ২০১২ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১। ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর হাজারে ১১ জন করে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টমতম, স্থানের দিক থেকে চুরানব্বইতম

অবস্থানে। ২০৩০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি অথচ আমাদের জমি বাড়বে না, আর কৃষিবিজ্ঞান যত উন্নতিই করুক ফসলের উৎপাদন এ হারে বাড়বে না।

আসলে সমস্যাটা বেশ জটিল জনসংখ্যা সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে সবার জন্য খাদ্য ও বাসস্থান জোগাড় করাই কঠিন হয়ে পড়বে এছাড়াও আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বস্ত্রের মতো অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের কাজ। আশার কথা বাংলাদেশে জন্মহার বর্তমানে কমতির দিকে। অন্যদিকে মৃত্যুহার কমানোতেও আমাদের অগ্রগতি হয়েছে। এক সময় আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল খুবই বেশি। ১৯৯০ সনে হাজারে ১৩৯ জন শিশু মারা যেত। বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার এক তৃতীয়াংশেরও নিচে নেমে এসেছে এই বাস্তবতাটিকে হিসেবে রেখে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কাজ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে ক্লাসে মুক্ত আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি. কতজন মানুষ বাস করে ?

ক. ১০২৫ গ. ১০৩০
খ. ১০২০ ঘ. ১০১৫

২. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট রয়েছে বাংলাদেশের –

i. দক্ষিণ উপকূলে
ii. চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে
iii. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও ii
খ. ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জামিলের বড় চাচা ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে শহিদ হন এ জন্য তাঁর পরিবার গর্বিত জামিলও আগ্রহান্বিত হয়ে বাবার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছে। তার বাবাও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। একজন মুক্তিযুদ্ধের সন্তান হিসেবে সেও গর্বিত

৩. জামিলের বড় চাচা শহিদ হয়েছিলেন-

ক. নিজের ইচ্ছায় গ. বন্ধুদের পরামর্শে

খ. দেশপ্রেমের কারণে ঘ. দেশ বিভাজনের জন্য

৪. জামিলের বড় চাচা যে যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন সে যুদ্ধকে আমরা অভিহিত করতে পারি–

i. নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধ

ii. পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ

iii. দেশ ও জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii গ. iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii, iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

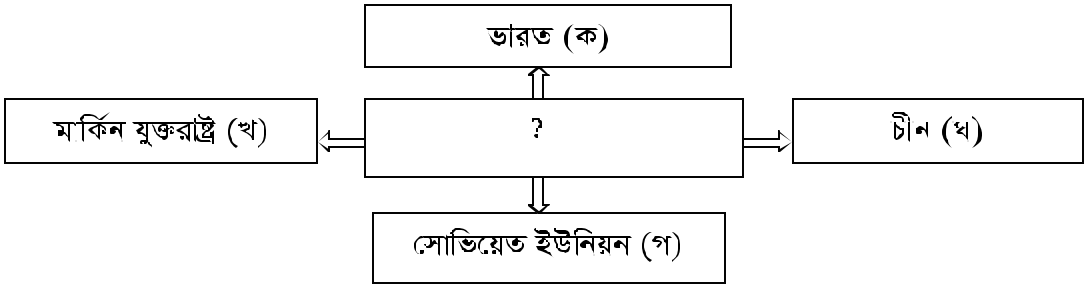

ক. উদ্দীপকে "?" প্রশ্নবোধক স্থানে কী বসবে?

খ. মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান কী ছিল?

গ. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থানকারী বৃহত্তর দেশগুলো কী প্রভাব ফেলেছিল ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. " বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকের 'ক' দেশটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়-তিন

প্রাচীন বাংলা এবং বর্তমান বাংলাদেশের জীবনধারা

আজকের বাংলাদেশে যে জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার শুরু ও বিকাশ হঠাৎ করে হয়নি। প্রাচীন বাংলার মানুষের হাতে রচিত হয়েছে এর ভিত আর কালে কালে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এর বিকাশ ঘটেছে। তাই আজকের বাংলাদেশের সমাজে অনেক পরিবর্তন এলেও আগের দিনের অনেক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা ধারাও লক্ষ করা যায়। মানুষের জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। আজকের বাংলাদেশের সংস্কৃতি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এতে প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বাঙালির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক জীবনধারা বিকাশে প্রাচীন বাংলার প্রভাব স্পষ্ট।

সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ধর্ম। বাংলাদেশের মানুষের বেশির ভাগ মুসলমান। কিন্তু এদেশে ইসলাম ধর্ম এসেছে মধ্যযুগে তাই প্রাচীন বাংলায় ইসলামের প্রভাব ছিল না। তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মই ছিল সমাজের প্রধান ধর্ম এখানে প্রাচীন বাংলা বলতে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের সীমানাকে বুঝানো হচ্ছে।

পাঠ-১ : প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাংলা

ভারতে প্রাচীন যুগের শুরুকে দেখা হয় সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে। কিন্তু তার আগেও মানব সমাজের বিকাশ ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, যার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। এই প্রাগৈতিহাসিক যুগকে নাম দেওয়া হয়েছে প্রস্তরযুগ। প্রস্তরযুগকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়- পুরনো প্রস্তরযুগ, মধ্য প্রস্তরযুগ এবং নব্য প্রস্তরযুগ। ভারতে প্রস্তরযুগের সূচনা হয়েছিল ২০ লক্ষ বছর আগে বলে মনে করা হয় এ সময়ে 'হোমো হাবিলিস' নামের মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল ভারতে। এ সময় মানুষ পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করত। ফলমূল কুড়িয়ে, পশু-শিকার অথবা মাছ ধরে তারা জীবন নির্বাহ করত। তারা যাযাবর জীবনযাপন করত। অনুমান করা হয় প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' নামক মানব প্রজাতি পূর্ব আফ্রিকা থেকে ভারতে আসে এরাই হচ্ছে সমকালীন দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর আদি পুরুষ। ভারতে কৃষির সূচনা হয় আনুমানিক নয় হাজার বছর আগে এবং তা বিস্তার লাভ করে আরও তিন হাজার বছর ধরে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত বেলুচিস্তানের মেহেরগড়ে গ্রাম গড়ে উঠেছিল। মানুষ আবিষ্কার করে লাঙলের আদিরূপ। শুরু হয় চাষাবাদ। পশুকে পোষ মানায়। শুরু করে স্থায়ী গোষ্ঠীগত জীবনযাপন। কৃষির আবিষ্কার সূচনা করে মানুষের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। সিন্ধু নদীর পলিসমৃদ্ধ জমিতে ফলে প্রচুর ফসল। তৈরি হয় অনেক উদ্বৃত্ত খাবার। এর ফলে গড়ে উঠে বাজার। গড়ে উঠে শহর। ব্যবসায়ী, প্রশাসক, পুরোহিত এবং যোদ্ধারা নিয়োজিত হতে থাকে অকৃষিজ পেশায়। একেই বলা হয় 'নগর বিপ্লব'

কাজ : নগরের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা লেখ।

পাঠ-২ : বাংলার মানুষের কথা

বাংলাদেশে কখন মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। পণ্ডিতদের অনুমান বাংলার মানুষও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এসেছে। পাথরের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে কুমিল্লার লালমাইয়ে, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে। এ থেকে বুঝা যায় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় মানুষ বাস করছে।

নানা দেশ থেকে এসে যারা বহুকাল এদেশে বাস করেছে তাদের রক্ত বাঙালির রক্তে মিশেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে বড় বড় যে সব জাতি এখানে এসেছে তার মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যদের প্রভাবই বেশি। এত জাতির মিশ্রণ ঘটেছে বলেই বাঙালিকে বলা হয় সংকর জাতি।

বাংলাদেশে আদিম সমাজের অস্তিত্ব ছিল। মানুষ তখন দলবদ্ধ হয়ে বনে বাস করত। নদীমাতৃক সমতল বাংলায় অনেক আগেই কৃষির প্রচলন ঘটে। বাঙালির আদি পুরুষ অস্ট্রিকরাই কৃষিকাজ শুরু করে। লাঙল শব্দটি এসেছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে। পরিবেশের কারণে মাছ শিকার ও ধান উৎপাদন বাঙালির প্রধান জীবিকা ছিল। বহু পূর্ব থেকেই বাঙালিরা নৌকা বানাতে জানত। জলপথে সহজে যাতায়াত ও ব্যবসার কাজে তারা নৌকা ব্যবহার করত।

আধুনিক কালে কৃষি ও শিল্পভিত্তিক সমাজের মিলিত রূপ বাংলাদেশে বিরাজ করছে। এই ধরনের সমাজকে উন্নয়নশীল সমাজ বলে।

কাজ : বাঙালিরা সংকর জাতি - এ কথাটি নিয়ে ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করে বিষয়টি নিয়ে নিজের ধারণা লেখ

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন কালে বিকাশ ঘটেছিল নগর সভ্যতার। যা সাধারণভাবে সিন্ধুসভ্যতা নামে পরিচিত। প্রাচীন নগরসভ্যতার একই ধারায় বাংলাদেশে সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি।

প্রাচীন ভারতের নগর সভ্যতা

প্রাচীন ভারতের নগরসভ্যতাকে সাধারণভাবে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। অনেক সময় এই সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। সিন্ধু নদ এবং এর শাখা নদী ইরাবতী ও রাভী নদীর তীরে এই সভ্যতার বেশিরভাগ নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এখানে পরিকল্পিত নগর গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার বড় দুটি নগরের একটি হরপ্পা আর অন্যটি মহেঞ্জোদারো। হরপ্পা বর্তমান ভারতের অংশে আর মহেঞ্জোদারো পাকিস্তানের অংশে অবস্থিত।

শহরের রাস্তা, রাস্তার পাশে ডাস্টবিন, সড়ক বাতি, পানি নেমে যাওয়ার জন্য ড্রেন সব কিছুই ছিল একেবারে সাজানো। একতলা-দোতলা ঘরবাড়ি ছিল পরিকল্পিতভাবে তৈরি। প্রত্যেক বাড়িতে পানির জন্য ছিল কুয়া। আর ছিল পয়ঃপ্রণালি–অর্থাৎ ময়লা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা।

মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে এক বিশাল গোসলখানা। হরপ্পাতে পাওয়া গেছে শস্য জমা রাখার জন্য বিশাল শস্যাগার। পোড়ামাটির বেশ কয়েকটি মূর্তিও পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। পাওয়া গেছে চুনা পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি। অনেক সীল পাওয়া গেছে এই সভ্যতার। সীলের গায়ে ছিল পশুমূর্তি আর লেখা যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মনে করা হয় ভারতের এই প্রাচীন সভ্যতাটি ১৯০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের আগে ধ্বংস হয়ে যায়।

সিন্ধু সভ্যতা কেন ধ্বংস হয়ে যায় তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা হয় জলবায়ুর পরিবর্তন বা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর আক্রমণে এই সভ্যতার পতন ঘটে। অনেকে অনুমান করেন এই সময়ে দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার জলবায়ু শীতল হয়ে যাওয়ায় ইন্দো-আর্য নামের এক যাযাবর জনগোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করে। এরাই সূচনা করে বৈদিক যুগের এবং হিন্দুধর্মের। সৃষ্টি হয় বেদের প্রার্থনাসংগীত, মহাভারত এবং রামায়ণের কাহিনী। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ভূমির উৎপত্তি যদিও প্রাচীন, তবু নদ-নদী বেষ্টিত জঞ্জালে ঘেরা এই নিম্নভূমিতে মানুষের বসতি শুরু হয়েছে বেশ পরে।

পাথরযুগে বাংলা

পলিমাটিতে গড়া বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মাটি লাখ লাখ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের বাংলাদেশে উত্তরের বরেন্দ্রভূমি, মধ্য অঞ্চলের মধুপুরের গড় এবং পূর্বদিকে লালমাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মাটি অনেক পুরনো। গবেষকরা খোঁজ পেয়েছেন এই পুরনো মাটির কোনো কোনো অংশে পাথরযুগের মানুষ বিচরণ করতো। ভারত উপমহাদেশে আদি মানবের যে বিচরণ ছিল তার প্রমাণ মিলেছে। পাওয়া গেছে পুরনো পাথরযুগের হাতিয়ার। এগুলোর মধ্যে ছিল শিকারের অস্ত্র, হাতুড়ি, কাটাছিলার উপযোগী হাতিয়ার ইত্যাদি।

আমরা অবশ্য প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন পেয়েছি উত্তর বাংলার বরেন্দ্রভূমিতে, কুমিল্লার লালমাইয়ে, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে, হবিগঞ্জে এবং নরসিংদীর উয়ারি-বটেশ্বরে। কিন্তু বাংলাদেশে পাথর না থাকায় এই কালের চিহ্ন ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে এ নিদর্শন থেকে বুঝা যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিচরণ ছিল এদেশের কোনো কোনো স্থানে। এমন কল্পনা করা হয়তো অমূলক নয় যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে আদি মানুষ পাড়ি দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া বা অস্ট্রেলিয়ায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপদ গড়ে উঠতে শুরু করে ৩০০০ থেকে ৩২০০ বছর আগে। লৌহযুগের সূচনা থেকে বনজঙ্গল কেটে মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। বাংলাদেশে ঠিক কখন কৃষিযুগের সূচনা হয় তা এখনও সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। কৃষির সাথে সাথে গড়ে উঠতে থাকে শহর। লোহার ব্যবহার কৃষির উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নগর। উয়ারি-বটেশ্বরে আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই।

বাংলাদেশের সভ্যতা

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো নগরসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মহাস্থানগড় ও উয়ারি-বটেশ্বরে। ধারণা করা হয় এখানে আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে নগর গড়ে উঠেছিল।

মহাস্থানগড়ে প্রথম নগর গড়ে তোলেন ভারতের মৌর্য বংশের সম্রাটরা ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল উত্তর বাংলায়। এর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। এই পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল আজকের মহাস্থানগড়ে, যা এখনকার বগুড়া জেলায় অবস্থিত। সেসময় এই রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পৃথিবীর অধিকাংশ নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। কারণ নদী থাকায় কৃষি কাজে সুবিধা হয়। বন্যার পর জমিতে পলি পড়ে উর্বর হয়। উর্বর মাটিতে ভালো ফসল ফলে। নদীর পানি কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। আবার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে নদী বড় ভূমিকা রাখে। নদীর সুবিধা নিয়ে মহাস্থানগড়েও নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীনকাল থেকেই করতোয়া নদী বয়ে গেছে মহাস্থানের পাশ দিয়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাটি খনন করে মৌর্য যুগের অনেক নিদর্শন পেয়েছেন।

উয়ারি–বটেশ্বর গ্রাম দুটির পাশ দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও এর শাখা আড়িয়াল–খাঁ, গঙ্গাজলি ও কয়রা নদী। উয়ারি–বটেশ্বরে খনন করে নানা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে পুণ্ড্রনগরে সভ্যতা গড়ার কিছুটা আগে এখানে নগর নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি ছিল বাণিজ্য নগরী। সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে মাটির দেয়ালে ঘিরে দেয়া হয়েছিল নগরটি।

কাজ-১ : সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তাতে কোন কোন জায়গায় পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৪ : প্রাচীন বাংলার শাসন

পাল পূর্ব যুগে শাসন

আজকের বাংলাদেশ প্রাচীনকালে একক কোনো দেশ ছিল না। তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে জনপদ গড়ে উঠে। আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে বাংলাদেশে উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে বাংলায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে আর্য শাসনের শেষ দিকে বাংলাদেশে আর্য শাসনের বিস্তার ঘটে। মৌর্যদের সময় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মৌর্য শাসনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বগুড়ার মহাস্থানগড় ছিল এ শাসনের কেন্দ্রস্থল। গুপ্ত শাসনামলে বাংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। এ আমলে তাম্রলিপ্তি ছিল বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। সপ্তম শতাব্দীতে শশাংক বাংলায় গৌড় রাজ্যের শাসন চালু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একশ বছর বাংলায় কোনো স্থায়ী শাসনের তথ্য পাওয়া যায় না। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসান ঘটান। প্রতিষ্ঠা করেন পাল সাম্রাজ্য। পাল বংশ বাংলায় ৪০০ বছর শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

পাল রাজত্বের সূচনা

পাল রাজারা ছিলেন এ অঞ্চলেরই মানুষ। এই রাজারাই বাংলায় প্রথম সুবিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজত্বের শুরুটা কিন্তু গল্পের মতো। সেটা এক চমৎকার কাহিনী। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার ছোটখাট রাজ্যগুলো কলহ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ভীষণ অস্থির এক নৈরাজ্যের কাল ছিল সেটা। এতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজাদের প্রতিনিধিরা মিলে তাদের মধ্য থেকে গোপাল নামে এক সৈনিককে রাজা নির্বাচন করে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। তিনি খুব যোগ্য লোক ছিলেন। ৭৫০ অব্দ থেকে ৭৭০ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। ধর্মপাল, দেবপাল এ বংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন। বলা যায় এ সময়েই বাঙালি সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে তখন বাংলার বেশিরভাগ মানুষ ছিল হিন্দু। পাল রাজারা ছিলেন উদার। তারা হিন্দুদের ধর্মপালনে বাধা দিতেন না। তাদের নানাভাবে সাহায্যও করতেন। তাই এসময় বাংলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ নিজের মতো করে বেড়ে উঠেছিল।

চিত্র ৩.১ : পাহাড়পুর বিহারের গায়ে পোড়ামাটির ফলক

পালযুগের সমাজ জীবন

পাল রাজারা তাঁদের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। প্রথম পর্বের তিনজন রাজাই ছিলেন খুব শক্তিমান। তাঁরা হচ্ছেন গোপাল (৭৫০–৭৭০), গোপালের ছেলে ধর্মপাল (৭৭০–৮১০) এবং ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (৮১০–৮৫০)। এসময় পাল রাজত্বের সীমা বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। পাল যুগের সমাজ কেমন ছিল তা জানার প্রধান উপায় হচ্ছে—এসময়ে তৈরি পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো দেখা। তাছাড়াও এসময়ের সাহিত্য ও বিদেশি পর্যটকদের লেখা বিবরণী থেকেও কিছু তথ্য জানা যায়। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক ছিল। এগুলো জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পালযুগে তালপাতার পুঁথিতে এমনসব ছবি আঁকা হয়েছে যা এখনও রসিকজনকে মুগ্ধ করে। এসব চিত্রে ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অনেক সামাজিক বিষয়ও ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রায় সব পাল রাজার বেশ ঝোঁক ছিল। প্রাচীন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নালন্দা এঁদের রাজ্যে বর্তমান বিহারের পাটনার কাছে অবস্থিত ছিল। পালযুগের পুঁথিচিত্র বিশ্বের চিত্ররসিকদের প্রশংসা পেয়েছে। পালযুগের কৃতী মানুষের আদর্শ হলেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। তিনি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ

চিত্র ৩.২ : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পালযুগে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করতো। সাধারণভাবে মানুষের জীবন বেশ সুখের ছিল। তবে শেষদিকের পাল রাজারা অতটা যোগ্য ছিলেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ বাড়তে লাগলো। গ্রামবাংলায় গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলো। এক সময় সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে পাল রাজাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। এগারো শতকের শেষ দিকে এমন এক অযোগ্য রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ কৃষক আর জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ বিদ্রোহ করে। এদের বলা হয় কৈবর্ত। একারণেই এই বিদ্রোহকে ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ বলা হয়। কৈবর্তদের নেতা ছিলেন দিব্য। তিনি বরেন্দ্রের রাজা হয়েছিলেন। এসব কারণে পাল যুগের শেষদিকে সমাজ জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়।

পালযুগের সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য

পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও সাধারণ প্রজার ধর্মপালনে বেশ উদার ছিলেন। এ যুগে বাঙালি সমাজে অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতো। পাল রাজারা ধর্মপালনে হিন্দুদেরও সহযোগিতা করতেন। হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য পাল রাজাদের জমি দান করার কথা ইতিহাসে জানা যায়। বৌদ্ধ বিহারের দেয়ালে সাঁটা অনেক পোড়ামাটির ফলকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। এসব দেখে বুঝা যায়, পাল যুগে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করতো। এই উদারতা ও সম্প্রীতির ভাব বাঙালির ঐতিহ্য।

কাজ– ১	:	পাল যুগের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা লেখ।
কাজ– ২	:	পাল যুগে বাংলার সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত কর।
কাজ– ৩	:	পাল যুগের সমাজ জীবনের সাথে বর্তমান সময়ের সমাজ জীবনের মিলের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ-৫ : প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনধারা

বৌদ্ধ পালরাজাদের শাসনের অবসান হলে হিন্দু সেন রাজাদের অধিকারে চলে আসে বাংলা। সেন যুগের সমাজ ছিল পাল যুগের চেয়ে অনেকটা আলাদা। পাল রাজাদের মতো সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন না সেন রাজারা। এ যুগে বাংলার সমাজ নানা শ্রেণি ও বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায়। জীবনধারাতেও আসে পরিবর্তন।

সেন শাসনের সূচনা

পাল আমলেই দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় দেব ও চন্দ্র উপাধি নেওয়া রাজবংশ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই দুই বংশের রাজারাও পাল রাজাদের মতো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদেশি আক্রমণে চন্দ্রদের পরাজয় ঘটে এগারো শতকে। সেন উপাধি নেওয়া এই আক্রমণকারীরা এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে। যোদ্ধা সেনরা এক সময় পাল রাজাদের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য বাংলায় এসেছিল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের শক্তি বাড়াতে থাকে। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তারা পাল সিংহাসন দখল করে নেন। এভাবে বাংলা বিদেশি শাসকদের অধিকারে চলে যায়। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের স্বাধীন রাজ্যের অবসান ঘটে দক্ষিণ ভারতের এই সেনদের হাতে। সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হেমন্ত সেন। তার পরে বাংলার রাজা ছিলেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন। ১২০৪ সনে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে সেন রাজত্বের কার্যত অবসান ঘটে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আরও কয়েক বছর সেন রাজত্ব টিকে থাকে।

সেনযুগের সমাজ জীবন

সেন যুগের উল্লেখযোগ্য রাজারা হচ্ছেন বিজয় সেন (১০৯৮–১১৬০ খ্রিঃ), বল্লালসেন (১১৬০–১১৭৮ খ্রিঃ) এবং লক্ষণসেন (১১৭৮–১২০৫)

সেনযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার এবং প্রসার ঘটে। পতন ঘটতে থাকে বৌদ্ধধর্মের। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে হিন্দুধর্মের আচার–অনুষ্ঠান, পূজা–পার্বণ বিকশিত হয়। সেনরাজারা ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতে শুরু করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভাজন সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। অন্য সমস্ত হিন্দুদের ভাগ করা হয় ৩৬ জাতে। ৫টি জাত পরে এর সাথে যুক্ত হয়। এর বাইরে ছিল ম্লেচ্ছ, ভিন প্রদেশি এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

সমাজজীবনে সেন শাসনের প্রভাব

সেন যুগে বাঙালির খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ পাল যুগের মতোই ছিল। তবে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় সমাজে পূজা–পার্বণের আয়োজন অনেক বেড়ে যায়। যার প্রভাব এখনকার বাঙালি হিন্দু সমাজেও রয়েছে। সেন যুগে সাধারণ মানুষের জীবন খুব সুখের ছিল না। সেন রাজারা ভেবেছিলেন বৌদ্ধরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। কারণ বৌদ্ধ রাজাদের হাত থেকে তাঁরা রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধদের দমিয়ে রাখার জন্য তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করা হতে থাকে। এ কারণে সেন যুগে বৌদ্ধ সমাজে দুর্দশা নেমে আসে। এদেশের সাধারণ হিন্দু যাদের শূদ্র শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল তাদের উপরও অত্যাচার চলতে থাকে।

সেন রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করার মতো শক্তি তখন বাঙালির ছিল না। তাদের ক্ষোভ মনের ভিতর জমা হতে থাকে। তবে কিছুকাল পরেই এর প্রকাশ ঘটেছিল।

কাজ– ১ : সেন যুগের বাংলার সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত কর।
কাজ– ২ : সেন শাসকরা কেন সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করতো তা বর্ণনা কর।
কাজ– ৩ : সেন শাসনে শূদ্রদের অবস্থা বর্ণনা কর।

পাঠ- ৬ : প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। নানা ধরনের শিল্পদ্রব্যও উৎপাদিত হতো এদেশে। এসব কারণে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তারপরও সকল সময়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল তা বলা যাবে না।

বাংলার কৃষি-অর্থনীতি

নদী–নালা–খাল–বিলের দেশ এই বাংলাদেশ। বাংলার মূল ভূমি নদীর পলি দিয়ে গঠিত। তাই এদেশের মাটি খুব উর্বর। এই মাটিতে সহজেই ফসল ফলে। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির প্রধান শক্তি ছিল কৃষি। সে যুগেও ধান ছিল প্রধান ফসল। এছাড়া প্রচুর আখ উৎপাদন হতো। আখের রস দিয়ে তৈরি হতো গুড় ও চিনি। জানা যায়– গুপ্ত যুগে আখ এবং আখের তৈরি গুড় ও চিনির জন্য বাংলার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই গুড় ও চিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও নিকটবর্তী অনেক দেশে রপ্তানি করা হতো। প্রাচীন যুগে তুলা, সরিষা ও পান চাষের জন্য

বাংলার খ্যাতি ছিল। প্রাচীন যুগে বেশ কয়েক ধরনের ফলের কথা জানা যায়, যা এদেশে প্রচুর ফলতো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার কুটির শিল্প

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার কারিগররা বেশ ভালো কাপড় বুনত। তাই এদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল কাপড়। তাঁতিরা বেশ মিহি সুতি ও রেশমি কাপড় বুনতে পারত। দেশের চাহিদা মিটিয়েও কাপড় এসময় বিদেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলার মসলিন কাপড়ের সুনাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই এই কাপড় তৈরি হতো। কাপড় ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল বাংলায়। এসব কারখানায় তৈরি হতো মাটির পাত্র, সোনা ও রুপার অলঙ্কার, নৌকা, গরুর গাড়ি ও নানা ধরনের কারুকার্য করা দ্রব্যসামগ্রী।

ব্যবসা-বাণিজ্য

কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ার ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত হতো। এসব দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করতে গিয়ে প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। দেশের ভিতরে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটায় এখানে অনেক হাট-বাজার ও গঞ্জ গড়ে উঠে। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরের নাম হচ্ছে তাম্রলিপ্তি, যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এই বন্দরের মাধ্যমে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করা হতো। বাংলাদেশের চট্টগ্রামেও সমুদ্র বন্দর ছিল। এখানে অষ্টম শতকে আরব বণিকরা তাদের জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন। তারা দীর্ঘদিন এই বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। স্থানীয় বণিকরা মালপত্র নিয়ে যেতেন সমুদ্র বন্দরে। সেখানে তারা আরব বণিকদের কাছে বিক্রি করতেন। আর আরব বণিকদের আনা দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিয়ে যেতেন। এখানকার বন্দরে আরব বণিকরা যেমন আসতেন তেমনি বাঙালি বণিকরাও সমুদ্রপথে বিদেশের সাথে বাণিজ্য করতেন।

কাজ- ১ : প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার কৃষি উৎপাদনের মিলগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৭ ও ৮ : প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন

সংস্কৃতির কথা

সংস্কৃতি শব্দটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কিন্তু শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি প্রতিটি সমাজে জীবন যাপনের জন্য রীতিনীতি ও প্রতীকের একটি ছক তৈরি হয়ে যায়, যার ভিতর দিয়ে তা শুভ, সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনা করে। প্রতীকের এ ছককে আমরা সংস্কৃতি বলে থাকি। এখানে আগত নানা জাতের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য।

আমাদের ভূমি যেমন উর্বর তেমনি সংস্কৃতিও বেশ সমৃদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে বলব। প্রথমত, আমাদের জীবনে রয়েছে উদার উর্বর প্রকৃতির ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, এখানে আগত নানা জাতির মানুষ, তাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ভূমিকা। চারপাশের প্রকৃতি এখানে যেমন জীবন্ত, মানুষও তেমনি প্রাণবন্ত। প্রকৃতির সাথে এই নিবিড় সম্পর্ক বাঙালির মন ও জীবনকে দিয়েছে বিশেষ রূপ।

আমাদের জীবনযাপনে মাটির ব্যবহার খুব বেশি, সেটি হাড়ি–কলসি থেকে পোড়ামাটির ফলক পর্যন্ত দেখে বেশ বুঝা যায়। বাঁশ, বেত, কাঠের ব্যবহারও বহুকালের। দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও অন্যান্য কাজে গাছপালা, জলাশয়ের অবদান বেশি। সাধারণ মানুষের মূল পেশা ছিল তিনটি– চাষ, তাঁত চালানো, মাছ ধরা অর্থাৎ তারা ছিল চাষি, তাঁতি বা জোলা আর জেলে। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে যেহেতু কখনো বন্যা কখনো ঝড়, কখনো অনাবৃষ্টি, হঠাৎ ঢল–এসব অনিশ্চয়তা থাকে তাই এখানে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস বেশ জোর পায়। গানে–কবিতায় তা প্রকাশ পেয়ে এসেছে বরাবর।

এখানে তিনটি বড় ভাষাগোষ্ঠী তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে আমাদের দেশে। তারা হলো অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য। তাদের প্রভাব আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এখনও আছে। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকেও আমাদের দেশে বৈচিত্র্য কম নয়। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম এখানে পালিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারে মুসলিম সুফি ও সাধকরাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। এভাবেই আজ বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ।

কিন্তু আমাদের রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসের দীর্ঘ ঐতিহ্য, নানা জাতের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কৃতি, বিভিন্ন ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা। এসব মিলে জনবৈচিত্র্যের মতোই বাঙালি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেও লালন করে আসছে।

চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলব। এখানে প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি তার রয়েছে ভাঙাগড়ার খামখেয়ালি। একে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব নয়।

চিত্র ৩.৩: লালন শাহ

চিত্র ৩.৪: কাজী নজরুল ইসলাম

বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি, ভাঙন ইত্যাদি এখানকার মানুষকে বরাবর পরমশক্তির প্রতি আকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত রেখেছে। সব ধর্মের মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস থেকে এ সাধনা করেছে। এই সাধনার মধ্যে আল্লাহ বা ঈশ্বরের কথা যেমন আছে তেমনি থাকে মানুষের কথা। বাঙালির সংস্কৃতিতে এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে সুরটি প্রধান সেটিকে বলা যায় মানবতাবাদ। অর্থাৎ মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। এসব কথা লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গানে আমরা শুনতে পাই

সেই সুলতানি আমলে কবি চণ্ডীদাস লিখেছেন– সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর নাম–না–জানা লোককবি লিখেছেন চমৎকার কবিতা– নানাবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ/ জগৎ ভরমিয়া দেখি সবই একই মায়ের পুত। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামও লিখেছেন– এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু–মুসলমান/মুসলিম তার নয়নের মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।

কাজ–১ : বিভিন্ন দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করে তার প্রদর্শনীর আয়োজন কর
কাজ–২ : বিভিন্ন কাব্যে বাঙালি–মনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে নিজের মনের কথা লেখ।
কাজ–৩ : বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কর।

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন

প্রাচীন বাংলায় কবিদের লেখা সাহিত্য ও বিদেশি পর্যটকদের লেখা ভ্রমণকাহিনী থেকে বাঙালির জীবনধারা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। সে সময়ের মানুষের রেখে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী দেখে এবং তা বিশ্লেষণ করেও প্রাচীন বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধর্ম সংস্কৃতিরই একটি অংশ। প্রাচীন বাংলা জুড়ে দুটো প্রধান ধর্ম ছিল। একটি হিন্দুধর্ম অন্যটি বৌদ্ধধর্ম। এই দুই ধর্মের মানুষের অবস্থানই ছিল প্রাচীন বাংলায় কিছু মানুষ অবশ্য প্রকৃতি পূজারী ছিলেন।

সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাচীন বাংলার মানুষের জীবনধারাই আসলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন। এ যুগের মানুষ খুব সরল জীবন যাপন করতো। বিভিন্ন দিক থেকে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারণা নেওয়া যায়।

ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয় প্রাচীন যুগেই। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন হলো চর্যাপদ বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা সহজভাবে ধর্মের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য তাদের মুখের ভাষায় লেখার একটি রূপ তৈরি করেন। এরই নাম হয় চর্যাপদ। এটি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এর আগে সাহিত্য রচনা করা হতো সংস্কৃত ভাষায়। প্রাচীন বাংলার শেষ দিকে বাংলা ভাষায় লেখা একটি কবিতার বই খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। বইটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে থাকা কবিতাগুলো সেন যুগের শেষ দিকে শ্রীধর দাস সংকলন করে নাম দেন সদুক্তিকর্ণামৃত। পালযুগের কবি সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিত' নামে একটি বই লেখেন। ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায় রামচরিতে অভিনন্দ নামেও একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তবে জগৎ বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, যিনি অনেক বই লিখেছিলেন দুঃখের বিষয় তাঁর সব বই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। সেন রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন উভয়েই কবি ছিলেন।

বেশভূষা

প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের পোশাকে তেমন জাঁকজমক ছিল না। কাপড়ে কোনো সেলাই করা হতো না। ছেলেরা ধুতি পরতো। মেয়েরা পরতো শাড়ি। ধনী পুরুষরা শরীরের উপরের অংশে চাদর জড়াতেন আর মেয়েরা জড়াতেন ওড়না। অনেক পোড়ামাটির ফলকে মেয়েদের চুলে খোঁপা দেখা যায়। ছেলেদের বাবরি চুল রাখার ছবিও আছে। এ যুগে নারী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরতেন।

যানবাহন

প্রাচীন বাংলায় স্থলপথে গরুর গাড়ি ও জলপথে নৌকা ছিল প্রধান বাহন। ধনী মহিলারা অনেক সময় পালকিতে চলাচল করতেন। তখন থেকেই এদেশে নানা রকমের নৌকার চল ছিল।

খাদ্য

এখনকার মতো প্রাচীন বাংলায় বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত-মাছ। শাক-সবজি এবং ডাল খাওয়ারও প্রচলন ছিল। বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে মাছ, মাংস, দই, পিঠা প্রভৃতির আয়োজন করা হতো। খাবারের পরে পান দেওয়ার রীতি সে যুগেও ছিল। সেকালের কবি লিখেছেন-'কচি শর্ষে শাক, নতুন চালের ভাত, হড়হড়ে দই-প্রচুর'। এ ছিল বাঙালির প্রিয় খাবার। তখন নানা রকম সরবতের প্রচলন ছিল বলেও জানা যায়।

আনন্দ উৎসব

প্রাচীন বাংলার মানুষ অবসর বিনোদনের জন্য গান, বাজনা ও নাচের আয়োজন করতেন। সে যুগে মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলারও আয়োজন করা হতো। পাশা ও দাবা সে যুগের বেশ প্রচলিত খেলা ছিল।

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় জীবন

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই সময়ে বাংলার আদি অধিবাসীরা ফল-ফুল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির পূজা করতেন। আর্যরা এদেশে আসার পর বাংলার মানুষ একটি নতুন ধর্মের সাথে পরিচিত হয়। এই ধর্মকে সাধারণভাবে বলা হতো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। সারা ভারতেই এই অবস্থা ছিল। এ কারণেই ভারতজুড়ে ধর্ম সংস্কার চলতে থাকে। এই সংস্কারের পথ ধরে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়। প্রাচীন বাংলায় পাল রাজাদের শাসনকালে বিকাশ ঘটে বৌদ্ধধর্মের। আর ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটে সেন শাসনকালে।

কাজ- ১ : প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত কর।
কাজ- ২ : প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় জীবনের সাথে বর্তমান যুগের গ্রামীণ হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনের মিল চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সদুক্তিকর্ণামৃত'– বইটি কে সংকলন করেছেন?

ক. অভিনন্দ
খ. শ্রীধর দাস
গ. সন্ধ্যাকর নন্দী
ঘ. অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

২. পাল যুগের রাজারা বাংলাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিল তা হলো –

i. শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে
ii. পুঁথিচিত্র রচনা করে
iii. উদার ধর্মীয় চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

বাংলাদেশের মানুষের নিকট অতিবৃষ্টি,অনাবৃষ্টি,ঝড়,সিডর,আইলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্যসঙ্গী। ঝড় হলে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করা যেমন তাদের কাজ তেমনি অনাবৃষ্টিতেও সৃষ্টিকর্তার নিকট বৃষ্টি কামনা করে গান গেয়ে উঠে–আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে–। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দিন কাটায় তারা।

৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে সংস্কৃতির যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো –

i. পরম শক্তিতে বিশ্বাস
ii. প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা
iii. গ্রামীণ জীবনবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. সংস্কৃতির উক্ত দিকটি দেশের সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে প্রকাশিত হয় –

i. জারি-সারি গানে
ii. কবিতার মাধ্যমে
iii. মানুষের আচরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. iii
খ. ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. লাবিব তার দাদাবাড়ি গিয়েছে। বেড়াতে বের হয়ে সে দেখতে পেল গ্রামটির অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটির তৈরি এবং প্রতিটি বাড়িতেই মাটির সুন্দর হাড়ি, কলস, ঘটি, বাটি, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি ব্যবহার করে। আবার কিছু বাড়িতে তাঁতিদের কাপড় বোনা দেখে লাবিব অভিভূত হলো।

ক. বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন কী?
খ. কৃষিকে প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির প্রধান শক্তি বলা হয় কেন?
গ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর ব্যবহারে কিসের পরিচয় ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর।
ঘ. লাবিবের দেখা পেশাটি প্রাচীন বাংলার ব্যবসা–বাণিজ্যের উন্নয়নে কোনো প্রভাব ফেলেছে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও।

২. শুভেচ্ছা জাদুঘরে গিয়েছে। সেখানে সে দেখতে পেল প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজাদের সময়কার তৈজসপত্র, মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্তি আঁকা পোড়ামাটির কিছু ফলক সুন্দর করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ক. প্রাচীন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের নাম কী?
খ. কৈবর্ত বলতে কী বুঝায়?
গ. শুভেচ্ছার দেখা ফলকগুলো কোন যুগের নিদর্শন? বর্ণনা কর।
ঘ. উক্ত ফলকগুলোতে তখনকার শাসনকালের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়- চার

রাষ্ট্র ও নাগরিক

মানুষ অনেক আগে জন্ম নিলেও প্রাচীন পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোনো নাগরিকের ধারণা। সময়ের পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে ৫ থেকে ৬ হাজার বছর আগে নদী ও সমুদ্রের তীরে প্রাচীন কিছু নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠে। নগর-রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। ধীরে ধীরে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১৯৬টি রাষ্ট্র রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ একটি। বর্তমান বিশ্বের লোকসংখ্যা সাত শ' কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার সবাই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা নাগরিক। যেমন আমরা সবাই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্র বা নাগরিক বলতে কী বুঝায়, কীভাবে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়, কীভাবে একটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করা যায়- এ অধ্যায় পাঠে এ সম্পর্কে আমরা জানব।

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের ধারণা

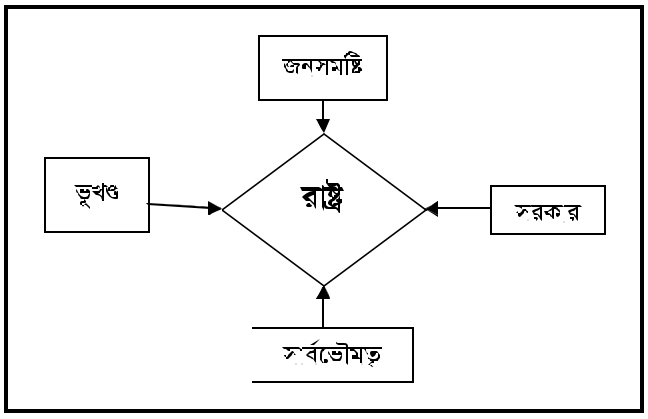

সাধারণ অর্থে রাষ্ট্র বলতে সরকার, দেশ, সমাজ, জাতি ইত্যাদিকে বুঝায়। আসলে তা নয়। 'রাষ্ট্র' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ বা ধারণা রয়েছে রাষ্ট্র হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একটি জনসমষ্টি। এ জনসমষ্টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অন্য কোনো দেশের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। একটি রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সরকার থাকে যার প্রতি জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই আনুগত্য স্বীকার করে। তাহলে বলা যায় রাষ্ট্র গঠনে চারটি উপাদান রয়েছে এগুলো হচ্ছে জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র গঠনের জন্য সকল উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক।

১. জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের প্রথম উপাদান হলো জনসমষ্টি। জনগণ হলো রাষ্ট্রের প্রাণ। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই লোকসংখ্যা কমও হতে পারে। আবার অনেক বেশিও হতে পারে। যেমন চীনের জনসংখ্যা প্রায় দেড়শ কোটি। অন্যদিকে 'সান ম্যারিনো' নামের একটি ছোট দেশের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে বার হাজার।

২. ভূখণ্ড : একটি রাষ্ট্রে কেবল জনসংখ্যা থাকলেই হবে না। জনসংখ্যার স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চাই একটি ভূখণ্ড। ভূখণ্ড ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। যারা অস্থায়ীভাবে নানা জায়গায় বাস করে তাদের অর্থাৎ যাযাবরদের কোনো রাষ্ট্র নেই এক্ষেত্রে ভূখণ্ড বলতে জল, স্থল ও তার উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলকে বুঝায়। রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টির মতো ভূখণ্ডের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আয়তনে অনেক বড় হতে পারে। আবার অনেক ছোটও হতে পারে। যেমন ভারতের আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,৫৯০ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান সিটির আয়তন যথাক্রমে প্রায় ৬৯৩ বর্গকিলোমিটার ও ০.১৮ বর্গকিলোমিটার। সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান নগর-রাষ্ট্র

৩. সরকার : রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র সকল কাজ করে থাকে, নিয়মকানুন আরোপ করে এবং জনগণকে পরিচালনা করে। জনগণ সরকারকে মেনে চলে। সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

৪. সার্বভৌমত্ব : এটি রাষ্ট্র গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অধিকার ও ক্ষমতা। রাষ্ট্র এ ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে-কাউকে যে-কোনো নির্দেশ দিতে পারে। তাকে সে আদেশ পালনে বাধ্য করতে পারে। সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র অন্য কোনো দেশ বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে। মোটকথা সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বময় ক্ষমতা। এ সার্বভৌম ক্ষমতার মূল অধিকারী হলো জনগণ। জনগণের পক্ষে সরকার তা প্রয়োগ করে। এ জন্য সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়াই উত্তম ব্যবস্থা।

অতএব, উপরের চারটি অপরিহার্য উপাদান ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। এর যে কোনো একটির অভাবে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। আমরা অনেকসময় ভুলবশত রাষ্ট্রকে সরকার বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়। সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উপাদান মাত্র।

কাজ-১ : ঢাকা ও লন্ডনকে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সহপাঠীদের সঙ্গে দলগতভাবে আলোচনা কর ও একটি প্রতিবেদন তৈরি করে উপস্থাপন কর।

পাঠ- ২ : রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে-সব উপাদান দরকার তার সবগুলোই বাংলাদেশের রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা জেনে নিই।

জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল। এর সংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শিশু। এরা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র।

চিত্র ৪.১ : বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী

ভূখণ্ড

বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা এ ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি। উত্তরে ভারত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ড বিস্তৃত। অসংখ্য নদনদী, হাওড়, পাহাড়, বনভূমি ও বিস্তৃত সমভূমি নিয়ে এ ভূখণ্ড গঠিত

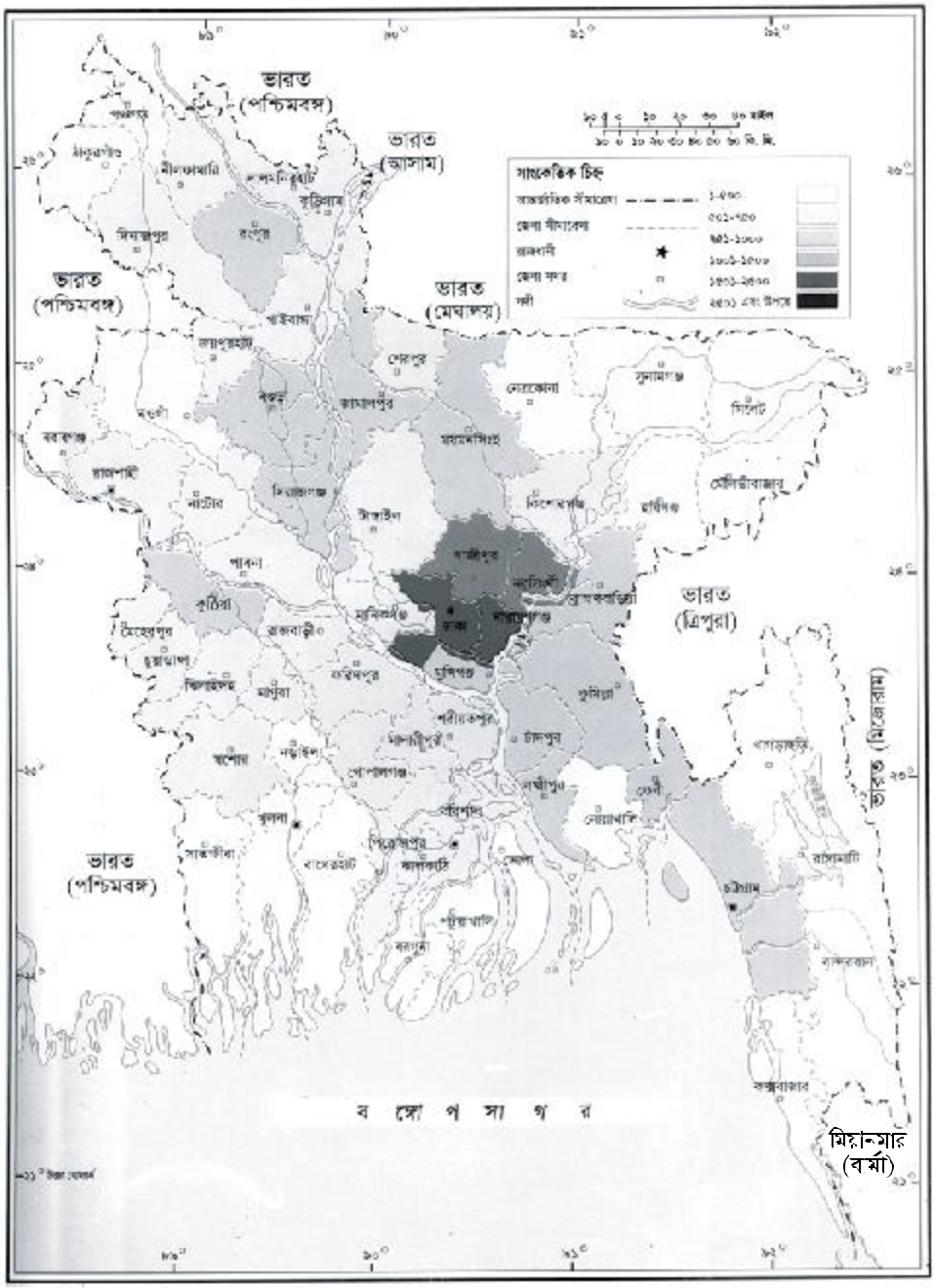

চিত্র ৪.২ : বাংলাদেশের মানচিত্র

সরকার

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত। এর নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার। এ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকারের সকল নিয়মকানুন ও আদেশ-নিষেধ জনগণ মেনে চলে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার (তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা) মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়।

চিত্র ৪.৩ : বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক

সার্বভৌমত্ব

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতার দ্বারা সরকার দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে ও অন্যদেশের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রেখে দেশ শাসন করে। এ কারণেই অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা।

উপরের আলোচনায় আমরা জেনেছি, রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের রয়েছে। এর রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা, সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, গণতান্ত্রিক সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা।

কাজ : দলগতভাবে এ পাঠে প্রদত্ত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী, ভূখণ্ড ও সরকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ-৩ : নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণা

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা এ রাষ্ট্রের অধিবাসী। রাষ্ট্রের অধিবাসীকে বলা হয় নাগরিক। সাধারণভাবে নগরের সকল অধিবাসীকেই আগে নাগরিক বলা হতো। তখন ছোট ছোট নগরকে কেন্দ্র করে গঠিত হতো রাষ্ট্র। এ নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই নাগরিক বলে গণ্য হতেন। তখন নগরের জনসংখ্যা ছিল কম, আয়তনও ছিল ছোট। বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বড়। এখন একটি রাষ্ট্রের রয়েছে অনেক নগর। তেমনি রয়েছে বিশাল জনসমষ্টি। এখন নাগরিকরা রাষ্ট্রের শাসনকাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না।

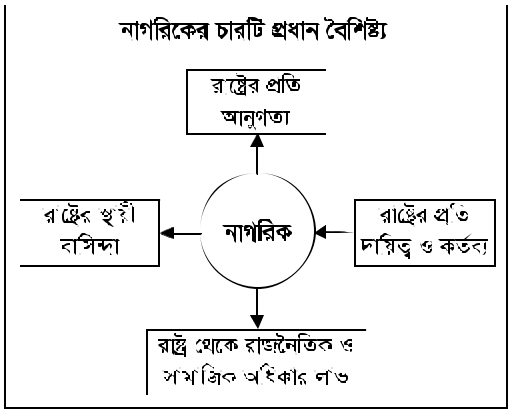

বর্তমানে নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণাও বদলে গেছে। এখন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে যে-কোনো ব্যক্তিই নাগরিক বিবেচিত হতে পারেন। নাগরিককে রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে আর রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। তাকে রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের যেমন রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার তেমনি রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য।

একজন নাগরিক রাষ্ট্রের পরিচয়েই নাগরিকত্ব পায়। তাই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশি। আমাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। জাতি হিসেবে আমরা বাঙালি। আমাদের রাষ্ট্রের ভাষা বাংলা। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীও রয়েছে। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন। তারাও বাংলাদেশের নাগরিক।

নাগরিক ও দেশবাসী

একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই রাষ্ট্রের অধিবাসী ও নাগরিক

নাগরিক ও বিদেশি

একটি রাষ্ট্রে নিজ দেশের অধিবাসী ছাড়াও ভিন্ন দেশের অনেক লোকও বাস করে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি নানা কারণে তারা অবস্থান করে। এরা বিদেশি হিসেবে পরিচিত। তারা এদেশের সরকারের বা রাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাই বিদেশিরা রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।

পাঠ-৪ : নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম

নাগরিকত্ব হলো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি এ পরিচয় লাভ করে। নাগরিকত্ব লাভের দুটি প্রধান উপায় হলো :

১. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ
২. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

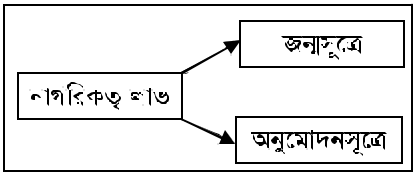

যারা জন্মসূত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা জন্মসূত্রে নাগরিক। আর যারা আবেদনের মাধ্যমে কোনো দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা অনুমোদনসূত্রে নাগরিক। অনুমোদনসূত্রে যারা নাগরিকত্ব লাভ করে রাষ্ট্রের আরোপিত কতগুলো শর্ত তাদের পূরণ করতে হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো :

১. জন্মসূত্র নীতি ও ২. জন্মস্থান নীতি

জন্মসূত্র নীতি

এ নীতি অনুযায়ী মা-বাবা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সন্তান সে-রাষ্টের নাগরিক হবে। কোনো বাবা-মার সন্তান বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও সে সন্তান মা-বাবার দেশের নাগরিক হবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এ নীতি

অনুসরণ করে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী কোনো জাপানি বা ফরাসি মা–বাবার সন্তান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও তার জাপান বা ফরাসি দেশের নাগরিক হবে। এভাবে বাংলাদেশি মা–বাবার সন্তান ঐসব দেশে জন্মগ্রহণ করলেও তারা বাংলাদেশের নাগরিক হবে।

জন্মস্থান নীতি

এ নীতি অনুযায়ী মা–বাবা যে–দেশেরই হোক না কেন সন্তান যে–দেশে জন্মগ্রহণ করবে সন্তান সে–দেশের নাগরিক হবে। এ নীতি জন্মস্থানের উপর নির্ভর করে। এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মা–বাবার কোনো সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিক হবে এবং সে–দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে। শুধু তাই নয়, এ নীতি অনুসরণকারী দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলেও সে সেই দেশের নাগরিক হবে। তবে বিশ্বের খুব কমসংখ্যক রাষ্ট্র এ নীতি অনুসরণ করে।

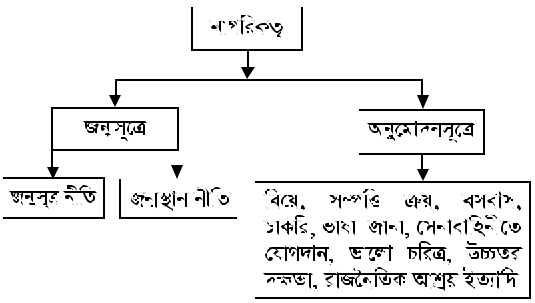

নাগরিকত্ব অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

এ পদ্ধতিতে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। এখন এক রাষ্ট্রের নাগরিক সহজেই অন্য একটি বা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হচ্ছে। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা–বাণিজ্য ছাড়াও নানা কারণে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশে বসবাস করতে হয়। এরূপ বসবাসকারী ব্যক্তির ঐ দেশের নাগরিকত্বের প্রয়োজন হয়। তখন রাষ্ট্রের কাছে ঐ ব্যক্তি আবেদন করেন। আবেদন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করে। নাগরিকত্ব লাভের পর ঐ ব্যক্তি সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের কিছু শর্ত আছে। কোনো ব্যক্তি অনুমোদনসূত্রে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবেন যদি তিনি–

১. রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করেন,
২. ঐ রাষ্ট্রের সম্পত্তি কেনেন,
৩. ঐ রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন,
৪. ঐ রাষ্ট্রে চাকরিরত থাকেন,
৫. ঐ দেশের ভাষা জানেন,
৬. ঐ রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন,
৭. ভালো চরিত্রের অধিকারী হন,
৮. উন্নততর দক্ষতার অধিকারী হন,
৯. রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভকারী ব্যক্তি উপরের শর্তগুলোর এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করলে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেন। ঐ দেশের নাগরিকদের মতো প্রায় সমান অধিকারের সুযোগ–সুবিধা তিনি ভোগ করবেন।

দ্বি-নাগরিকত্ব

একই ব্যক্তি দুটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করলে তাকে দ্বি-নাগরিকত্ব বলে। কোনো বাংলাদেশি বাবার সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে স্বাভাবিক নিয়মে ঐ দেশের নাগরিক হয়। অন্য দিকে মা-বাবা বাংলাদেশি হওয়ায় সে বাংলাদেশেরও নাগরিক। এ ক্ষেত্রে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ইচ্ছা করলে যে-কোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। তবে ইচ্ছা করলে সে দুটি রাষ্ট্রেরই নাগরিকত্ব রাখতে পারে।

কাজ : নাগরিকত্ব লাভের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

পাঠ-৫ : দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা

রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র আছে বলেই সেখানে নাগরিক আছে। আবার নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। কোনো দেশের নাগরিকরা যত ভালো হবে, সুনাগরিক হবে, সে দেশ তত বেশি উন্নতির দিকে যাবে।

সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা দেশের কাছ থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করি। বিনিময়ে নাগরিক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ ভোট দিয়ে একটি দলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠনে সহায়তা করে। সরকার যদি দেশের জন্য কল্যাণকর নয় এমন কোনো কাজ করে তাহলে জনগণই পরবর্তী সময়ে ঐ দলকে আর ভোট দেয় না। রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নসহ সবকিছুই তাই নির্ভর করে নাগরিকের সততা, দক্ষতা তথা নাগরিক হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপর। দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয়। নাগরিকদেরও নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তাহলেই দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজ : নাগরিক হিসেবে তুমি দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করবে তার একটি ছক তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মূল অধিকারী কে?

ক. জনগণ
খ. সরকার
গ. রাষ্ট্র
ঘ. সমাজ

২. রাষ্ট্রের জন্য সরকারের অপরিহার্যতা –

i. দেশ পরিচালনায়
ii. জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায়
iii. দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

'ক' রাষ্ট্রে নিজের দেশের নাগরিক ছাড়াও অন্যান্য দেশের লোক বাস করে। হঠাৎ 'খ' রাষ্ট্রের সাথে 'ক' রাষ্ট্রের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের লোক নিজ দেশে চলে গেল কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সরকারের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। যুদ্ধে 'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রকে দখল করে নিল।

৩. 'ক' রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের নাগরিকদের চলে যাওয়ার কারণ —

i. তারা 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিক নয়
ii. 'ক' রাষ্ট্র তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারে না
iii. তারা 'ক' রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii ও iii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. 'খ' রাষ্ট্র কর্তৃক 'ক' রাষ্ট্র দখল করে নেওয়ায় 'ক' রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি বিলুপ্ত হলো–

ক. জনসমষ্টি গ. ভূখণ্ড
খ. সরকার ঘ. সার্বভৌমত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাকির সাহেব ও আফরিন দম্পতি চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরের অধিক সময় ধরে বসবাস করছেন। সেখানে তাদের ছেলে স্বননের জন্ম হয়। তারা সেখানে নিজেদের আয় থেকে একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ক্রয় করেন। সরকারকে নিয়মিত আয়কর দেন। দেশের আইনকানুন মেনে চলেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি তহবিল পরিচালনা করেন। এই দম্পতি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ক. নাগরিক কিসের পরিচয়ে নাগরিকত্ব লাভ করে?
খ. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই নাগরিক নয় কেন?
গ. জাকির সাহেবের নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জাকির সাহেব ও স্বননের নাগরিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলাদেশের অধিবাসী সজীব সিঙ্গাপুরে মেরিন সার্ভিসে কর্মরত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান মেয়েকে তিন বছর হয় বিয়ে করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকার একটি জাহাজে করে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পূর্বেই জাহাজে তাদের মেয়ে মারিয়ার জন্ম হয়। বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা সজীবের ছোট ভাই সাগর গত নির্বাচনে সেখানে ভোট দিতে পারেনি।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কোথায়?
খ. দ্বি-নাগরিকত্ব বলতে কী বুঝায়?
গ. মারিয়া কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সজীব বা সাগরের নাগরিক অধিকার ভিন্ন'– উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

অধ্যায়-পাঁচ

বিশ্ব–ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ

অনেকগুলো দেশ নিয়ে একটি মহাদেশ গড়ে উঠে। পৃথিবীর স্থলভাগের একেকটি বড় অংশকে মহাদেশ বলা হয়। পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ রয়েছে। মহাদেশ ছাড়াও রয়েছে মহাসাগর, যেমন–প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর। বাকি দুটি মহাসাগর হলো উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। মহাসাগরগুলো বিভিন্ন মহাদেশকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মহাদেশগুলোর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অর্থনীতি, মানুষের জীবনযাত্রাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাসাগরগুলো ভূমিকা রাখে। মহাসাগর ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে কয়েকটি বড় সাগর বা সমুদ্র। যেমন : আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি। আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এটি আসলে একটি উপসাগর, যা ভারত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশটি যে মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত তার নাম এশিয়া। এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। শুধু আয়তনে নয়, জনসংখ্যার দিক দিয়েও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। আর এই মহাদেশে বাংলাদেশের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। পৃথিবীর বুকেও গর্বোন্নত একটি দেশের নাম বাংলাদেশ। দীর্ঘ রাজনৈতিক–সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও ১৯৭১–এ একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে এই দেশটি তার স্থান করে নিয়েছে।

পাঠ-১ : ভৌগোলিক পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি, পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা। পৃথিবীর আয়তনের মাত্র ২৯ ভাগ হচ্ছে স্থলভাগ। বাকি অংশ জলরাশি। এই জলরাশির মধ্যেও রয়েছে অনেক দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ। এগুলো মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কোনো না কোনো মহাদেশেরই অংশ।

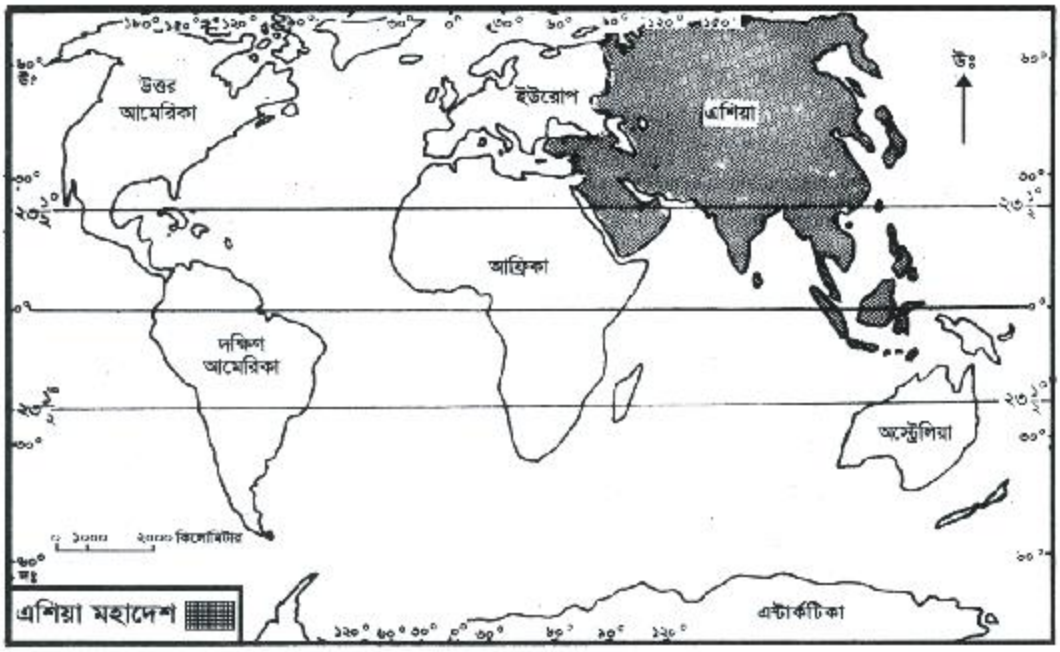

চিত্র ৫.১ : পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশ

পূর্বের পৃষ্ঠায় পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশ ছাড়াও মহাসাগর, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে। মহাদেশগুলোর সবটাই সমতল ভূমি নয়। সমতল ভূমি ছাড়াও পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, বনভূমি, নদনদীসহ অনেক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সেখানে রয়েছে। দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর। এগুলোতে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র। কোনো কোনো দেশ আছে যা দ্বীপ বা দ্বীপের সমষ্টি। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে ও ভারতীয় উপমহাদেশে।

কাজ- ১ : বিশ্বমানচিত্রে সাতটি মহাদেশ ও তিনটি মহাসাগর চিনে নাও।
কাজ- ২ : পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় দ্বীপ দেশ চিনে নাও।

পাঠ-২ : এশিয়া মহাদেশের অবস্থান ও আয়তন

এশিয়া মহাদেশ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের তিন ভাগের এক ভাগ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এর আয়তন ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬২ বর্গকিলোমিটার। ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন যোগ করলে কিংবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে একত্র করলেও এশিয়ার সমান হবে না। চার শ' কোটিরও বেশি লোকের বাস এই মহাদেশে। শুধু আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকেই যে এশিয়া বিরাট তাই নয়, এখানেই গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতা। সুদূর অতীতে চীন, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, হিব্রু এবং সিন্ধু সভ্যতা এখানেই গড়ে উঠে। এশিয়ায় যখন এসব সভ্যতা গড়ে উঠে তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় সভ্যতার আলো পৌঁছেনি। সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন চীনের মহাপ্রাচীর ও ব্যাবিলনের শূন্য-উদ্যান এ মহাদেশেই অবস্থিত।

চিত্র ৫.২ : চীনের মহাপ্রাচীর

চিত্র ৫.৩ : ব্যাবিলনের শূন্য-উদ্যান

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর উত্তরে যেমন আছে বরফে আচ্ছাদিত এলাকা সাইবেরিয়া, তেমনি পশ্চিমে আছে উত্তপ্ত মরুভূমি। তবে এ মহাদেশের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ অঞ্চল সমতল। পৃথিবীর বড় সাতটি নদীই এশিয়া মহাদেশে প্রবাহিত। সেই সাথে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ৮৮৫০ মিটার উঁচু মাউন্ট এভারেস্ট এ মহাদেশে অবস্থিত। ব্রিটিশ–ভারতের জরিপ বিভাগের প্রধান স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে শৃঙ্গটির নাম রাখা হয়েছে মাউন্ট এভারেস্ট। তবে এর উচ্চতা মেপেছিলেন এক বাঙালি, নাম-রাধানাথ শিকদার এই পর্বতসমূহ ও নিকটবর্তী পর্বত সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। নেপালের তেনজিং শেরপা ও নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি ১৯৫৩ সালে প্রথম এভারেস্ট পর্বতচূড়ায় আরোহণ করেন।

চিত্র ৫.৪ : মাউন্ট এভারেস্ট

বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরীনও এই পর্বত চুড়ায় আরোহণ করেছেন। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগরও এশিয়া মহাদেশেই অবস্থিত।

চিত্র ৫.৫ : তেনজিং শেরপা

চিত্র ৫.৬ : এডমন্ড হিলারি

পাঠ- ৩ : জনসংখ্যা ও অধিবাসী

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ষাট ভাগের বেশি মানুষ বাস করে এশিয়া মহাদেশে। ২০১১ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দাড়িয়েছিল ৭০০ কোটিতে। এর মধ্যে এশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৪২১ কোটি ৬০ লক্ষ। এ হিসেবে বিশ্বের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ লোকের বসবাস এই মহাদেশে। যদিও এশিয়ার মোট এলাকা পৃথিবীর মোট ভূভাগের মাত্র তিন ভাগের একভাগ। তার মানে এই মহাদেশটিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি। মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার তুলনামূলকভাবে কম মানুষ বাস করে। কিন্তু পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের দেশগুলো ঘন জনবসতিপূর্ণ। এশিয়া মহাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস এ এলাকায়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৬ জন। এশিয়া মহাদেশে চীনের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি– ১৩৫ কোটি, তারপরের স্থানটিই ভারতের– প্রায় ১২৩ কোটি ৭০ লক্ষ।

অর্থনীতি

এশিয়া মহাদেশটি কৃষিপ্রধান। এর মধ্যে চীন পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। একইভাবে ভারত প্রধান পাট উৎপাদনকারী ও বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এ মহাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই মহাদেশটির ভূগর্ভে তেল, গ্যাস, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লোহা, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায়। জ্বালানি তেল ছাড়া শিল্প–কারখানা ও যানবাহনসহ, বলতে গেলে সারা পৃথিবীই অচল। পৃথিবীর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, আরব আমিরাত ও কুয়েতে উত্তোলিত হয়। সারা বিশ্ব এ অঞ্চলের তেলের উপর নির্ভরশীল। সাগর–মহাসাগর ও নদ–নদীর সুবিধা থাকায় প্রাচীনকাল থেকেই এ মহাদেশের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা–বাণিজ্য গড়ে উঠে। এ মহাদেশের চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারত শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছে। জাপান পৃথিবীর তৃতীয় শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশও তৈরি পোশাক শিল্পে এগিয়ে আছে।

ধর্ম

পৃথিবীর প্রায় সবগুলো প্রধান ধর্মের উদ্ভব এশিয়ায়। প্রাচীন ধর্মের মধ্যে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধধর্মের জন্ম এশিয়াতেই। এরপর ইহুদি ও পরে খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব ঘটে দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। দক্ষিণ–পশ্চিম–এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য থেকেই সপ্তম শতকে ইসলামধর্ম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সৌদি আরবের মক্কায় মুসলমানদের পবিত্র কাবা শরীফ অবস্থিত। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান গয়া ও কাশী এবং বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ বুদ্ধগয়া এশিয়ার ভারতে অবস্থিত। পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র ধর্মস্থান জেরুজালেম শহরে অবস্থিত।

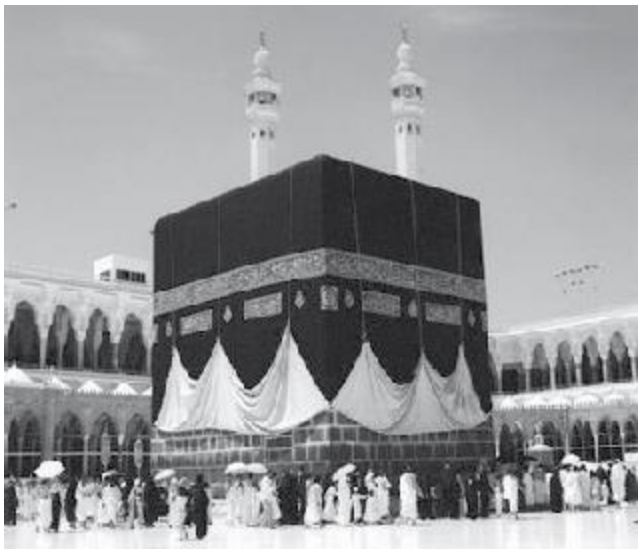

চিত্র ৫.৭ : কাবা শরীফ

চিত্র ৫.৮ : কাশীর মন্দির, বেনারস, ভারত

চিত্র ৫.৯ : থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ স্বর্ণমন্দির

কাজ– ১	:	এশিয়ার মানচিত্রে প্রাচীন সভ্যতার স্থানগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ– ২	:	এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজধানীসহ একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৪ : এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান

আমরা জানি মানচিত্রের উপরের দিককে উত্তর, নিচের দিককে দক্ষিণ, ডান দিককে পূর্ব এবং বাম দিককে পশ্চিম ধরা হয়। এবার আমরা মানচিত্র দেখে এশিয়া মহাদেশের অবস্থান জেনে নিই।

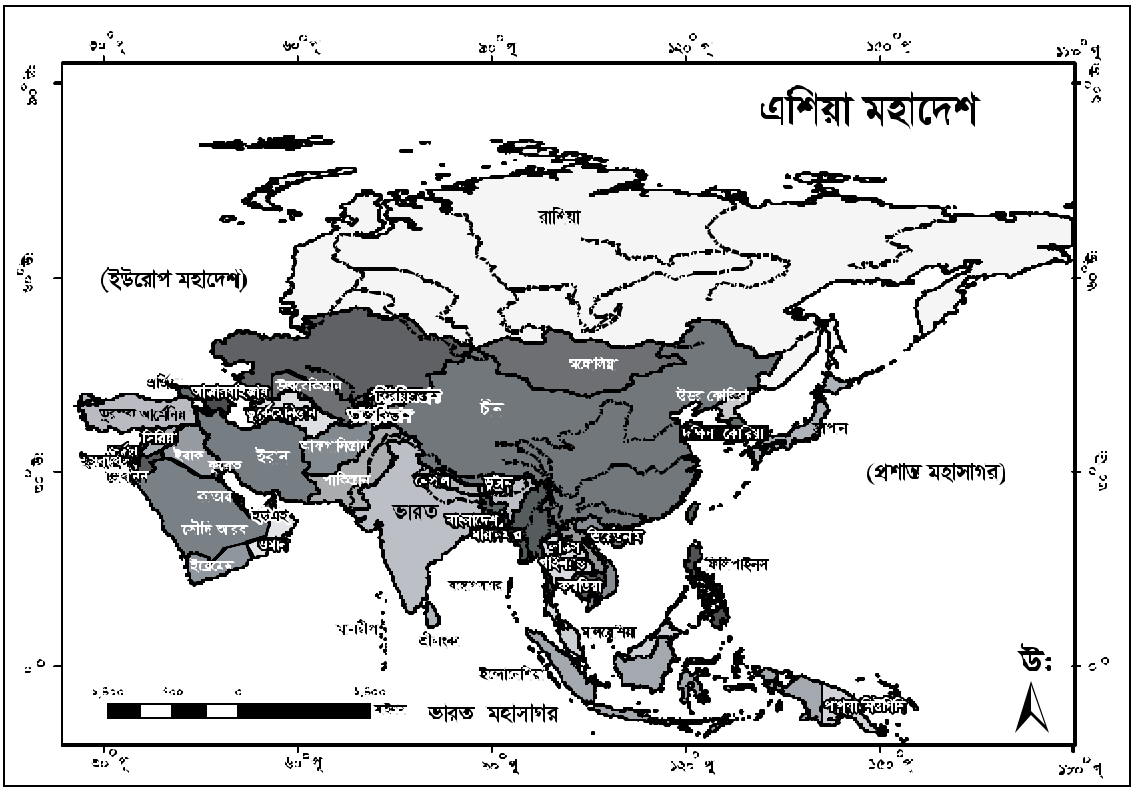

চিত্র ৫.১০ : এশিয়া মহাদেশের মানচিত্র ও সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান

এশিয়া মহাদেশের উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে লোহিত সাগর ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। উরাল পর্বতমালা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশকে পৃথক করেছে। এশিয়া মহাদেশের উল্লেখযোগ্য নদীগুলো হলো ইয়াংসি, হোয়াংহো, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র। চীনের ইয়াংসি এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬৩০০ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ও আয়তনে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ চীন, আর ছোট দেশ মালদ্বীপ। চীনের লোকসংখ্যা, আমরা আগেই জেনেছি, ১৩৫ কোটি। আর মালদ্বীপের জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার (২০১২)।

এশিয়ার মোট ৫১টি রাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চীন, ভারত, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এশিয়া বা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখব, একেবারে পূর্বপ্রান্তের দেশটির নাম জাপান। জাপানকে তাই 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলা হয়। চীন ও জাপান দুটি দেশই শিল্পায়নে শুধু এশিয়ার মধ্যে নয়, পৃথিবীর মধ্যেও প্রধান অবস্থানে আছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতও এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ অংশে। এই দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা, যার নাম 'সার্ক'।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ

চিত্র ৫.১১ : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

আগেই আমরা জেনেছি বাংলাদেশ এশিয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ হলো ভারত ও মিয়ানমার। নেপাল ও চীনও বাংলাদেশ থেকে বেশি দূরে নয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি আরও দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। শ্রীলংকা দেশটির চারদিক ঘিরে রয়েছে ভারত মহাসাগর। আর মালদ্বীপের দিকে তাকালে মনে হয় দেশটি যেন সাগরেই ভাসছে। এটি অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। অন্যদিকে নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। এদের কোনো সমুদ্রবন্দর নেই। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের জন্য এদের প্রতিবেশী ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনেক সুবিধাজনক। আমাদের আছে বঙ্গোপসাগর। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে জাহাজযোগে যা কিছু আমদানি-রপ্তানি করা হয় তা এ বন্দর দুটির মাধ্যমে হয়। বঙ্গোপসাগরের তীরে কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। এছাড়া টেকনাফ, সেন্টমার্টিন এবং পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতও আমাদের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান।

চিত্র ৫.১২ সুন্দরবন

চিত্র ৫.১৩ : তাজিনডং

শুধু সমুদ্রই নয়, বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন। আমাদের দেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা তিনটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিনডং (বিজয়) বান্দরবানে অবস্থিত। এর উচ্চতা ১২৩১ মিটার। আমরা এর আগে জেনেছি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৫০ মিটার যদিও এভারেস্টের তুলনায় তাজিনডং অনেক নিচু, তবুও আমরা নিজেদের উচ্চতম পর্বত নিয়ে গর্ব করতে পারি।

আমরা আগেই জেনেছি, এশিয়া মহাদেশের আয়তন ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬২ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪২১ কোটি ৬০ লক্ষ। আমাদের বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার অথচ জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। কৃষিপ্রধান এ দেশটির উন্নতির প্রধান অন্তরায় দ্রুত ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

কাজ– ১ : বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত কর।

কাজ– ২ : বাংলাদেশের ৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা লেখ।

পাঠ – ৫ : পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব

অনেকগুলো দেশ নিয়ে যেমন একটি মহাদেশ, তেমনি বহু সাগর নিয়ে গড়ে উঠে মহাসাগর। উন্মুক্ত, বিরাট ও সুগভীর জলরাশিকে মহাসাগর বলা হয়। পৃথিবীতে এ রকম পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর। পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৭১ শতাংশ পানি এবং ২৯ শতাংশ স্থলভাগ। এবার আমরা প্রথমে কয়েকটি মহাসাগরের কথা জানব। তারপর জানব আমাদের বঙ্গোপসাগরের কথা।

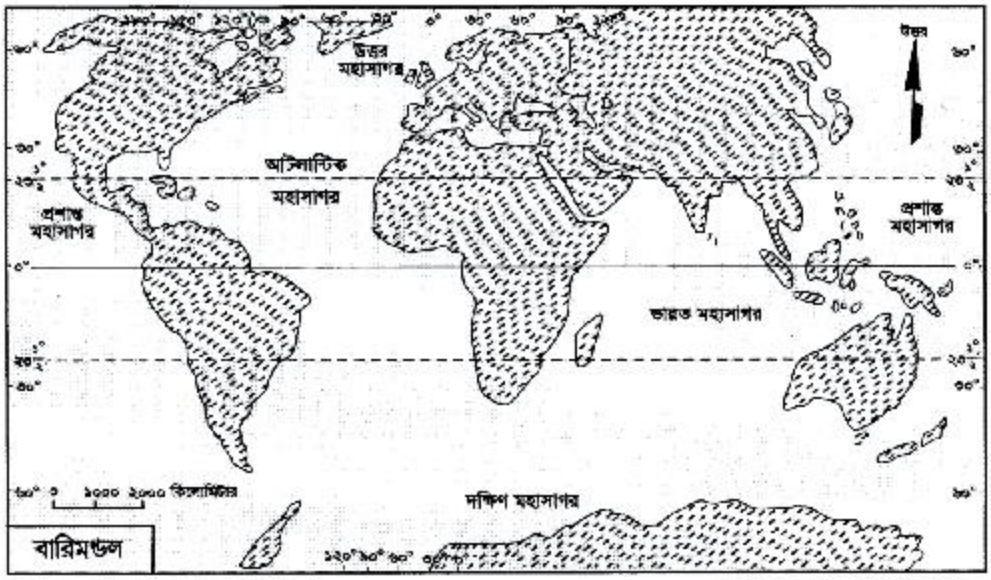

চিত্র ১.১৪ : পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

প্রশান্ত মহাসাগর

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর হলো প্রশান্ত মহাসাগর। এর এই নামের পিছনে একটি কাহিনী আছে। পর্তুগিজ নাবিক ফার্দিনান্দ মুজালিন অথবা ম্যাজিলন এ মহাসাগরের নাম দেন প্যাসিফিক। প্যাসিফিক শব্দের অর্থ শান্ত। এর জলরাশির শান্ত রূপ দেখে তিনি এর নামকরণ করেন। পানির বিস্তার, গভীরতা ও আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর। পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ স্থান জুড়ে আছে এই মহাসাগর। এটি পৃথিবীর অর্ধেক পানির আধার। এ মহাসাগরে ২৫ হাজারেরও বেশি দ্বীপ রয়েছে এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্যসব সাগর-মহাসাগরের দ্বীপের অর্ধেক। প্রশান্ত মহাসাগরে মিশেছে এমন সাগরগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান সাগর, পীত সাগর ও চীন সাগর।

আটলান্টিক মহাসাগর

প্রাচীনকালে রোমানরা সম্ভবত আটলাস পর্বতের নামানুসারে এই মহাসাগরের নাম দেন আটলান্টিক। আবার অনেকে মনে করেন রূপকথার হারানো রাজ্য আটলান্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের নামকরণ হয়েছে। মহাসাগরগুলোর মধ্যে আয়তনে এটি দ্বিতীয় হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম। এ মহাসাগর দখল করে আছে পৃথিবীর ২০ শতাংশ জায়গা। আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর আটলান্টিক ও দক্ষিণ আটলান্টিক এই দুভাগে বিভক্ত। এ মহাসাগরের পূর্ব দিকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর্কটিক মহাসাগর ও এন্টার্কটিক মহাসাগর। গভীরতার দিক থেকে এ মহাসাগরের স্থান তৃতীয়।

ভারত মহাসাগর

মহাসাগরগুলোর মধ্যে ভারত মহাসাগর আয়তনের দিক থেকে তৃতীয় এবং গভীরতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জলরাশি এ মহাসাগর ধারণ করে আছে। এ মহাসাগরের উত্তরে এশিয়া, পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত। এ মহাসাগরের উত্তরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর

বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশের দক্ষিণে বিস্তৃত বিশাল জলরাশির নাম বঙ্গোপসাগর। এটি আসলে ভারত মহাসাগরেরই উত্তর দিকের প্রশস্ত অংশ। আমাদের ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, কর্ণফুলিসহ অসংখ্য নদ-নদীর জলপ্রবাহ এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। এছাড়া ভারতের গঙ্গা, যমুনা, মহানন্দা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীসহ অনেকগুলো নদী এসে মিশেছে এখানে। মিয়ানমারের ইরাবতী ও নাফ নদীও এসে মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে।

বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন। এ ছাড়াও রয়েছে মহেশখালী, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপ। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বঙ্গোপসাগরের তীরে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় অবস্থিত। দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর খুলনার মংলাও বঙ্গোপসাগরের তীরেই অবস্থিত। পটুয়াখালীর পায়রা নদীর মোহনায় বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অন্য বিখ্যাত সমুদ্রবন্দরগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারতের কলকাতা, মাদ্রাজ, শ্রীলংকার কলম্বো এবং মিয়ানমারের ইয়াংগুন ও আকিয়াব।

বঙ্গোপসাগরের উত্তরে ভারত ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বদিকে মিয়ানমার এবং পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলংকা। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে আরও রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের আয়তন প্রায় বাইশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এ সাগরের গড় গভীরতা পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি।

বঙ্গোপসাগর নানা কারণে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সংযোগপথ এই বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়েই। বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়। এ বৃষ্টির ফলেই কৃষিনির্ভর আমাদের দেশে নানা ফসল জন্মায়। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে প্রচুর মৎস্য-সম্পদ। প্রায় পাঁচ শ' প্রজাতির মাছ রয়েছে এ সাগরে যার মধ্যে রূপচাঁদা, ইলিশ, ছুরি, লাক্ষা, লইট্টা, ফাইস্যা, পোয়া, কোরাল প্রভৃতির নাম করা যায়। শুধু দশ রকমের চিংড়িই রয়েছে এ সাগরে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব মাছ বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে বিপুল গ্যাস সম্পদ। আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীরা বঙ্গোপসাগরের পানি থেকে লবণ উৎপাদন করে। তাতে দেশের লবণের চাহিদার প্রায় সবটুকু মিটে যায়। সাগরের শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক সংগ্রহ করেও অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে। কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে ঝিনুকশিল্প। বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। আমরা আগেই জেনেছি এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। বাংলাদেশ সরকার মহেশখালি দ্বীপের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরের বুকে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মহাসাগর ও সাগরের গুরুত্ব

পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাগর ও মহাসাগরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারত আবিষ্কার অভিযানে বেরিয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে এসে পৌঁছান। এতে পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগের পথ খুলে যায়। পরে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন এ নাবিক। স্পেনের নাবিক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। অষ্টম শতকে আরবের বণিকেরা আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও জ্ঞানচর্চার প্রসারও ঘটে এভাবে। সাগর ও মহাসাগরগুলোর নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো মনোরম পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

কাজ- ১ : বিভিন্ন মহাসাগরের আয়তন ও অবস্থানের একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ২ : বঙ্গোপসাগর কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে সেগুলো ক্রমান্বয়ে সাজাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কী?

ক. ইয়াংসি
খ. ব্রহ্মপুত্র
গ. ইউফ্রেটিস
ঘ. হোয়াংহো

২. এশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশ বলার কারণ হলো, এ মহাদেশে –

i. জনসংখ্যা ও আয়তন সর্বাধিক
ii. সর্বপ্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল
iii. প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

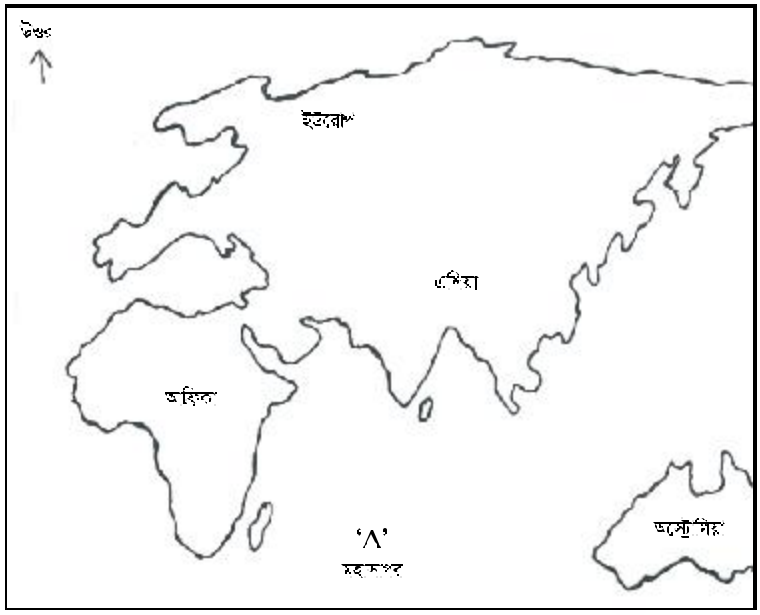

৩. চিত্রের 'Λ' চিহ্নিত মহাসাগরটির নাম কী ?

ক. প্রশান্ত মহাসাগর
খ. ভারত মহাসাগর
গ. আটলান্টিক মহাসাগর
ঘ. উত্তর মহাসাগর

৪. উক্ত চিহ্নিত মহাসাগরটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ –

i. এটি পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর
ii. পৃথিবীর ২০ শতাংশ স্থান জুড়ে এ মহাসাগরের অবস্থান
iii. সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে এটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. iii
খ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

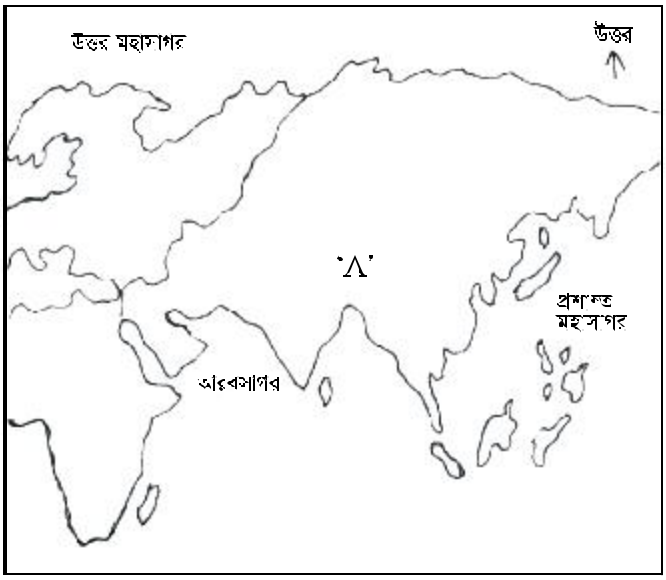

ক. পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?
খ. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠে কেন?
গ. চিত্রের 'A' চিহ্নিত মহাদেশটির ভূ-প্রকৃতি কেমন? বর্ণনা কর।
ঘ. পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত মহাদেশটির কোনো ভূমিকা আছে কী? তোমার মতামত দাও।

২. বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তানিশা বাবা মায়ের সঙ্গে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গিয়েছে। তানিশা সেখানে দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক দেখতে পেল। বাবা বললেন, এই যে বিশাল জলরাশি দেখছ এটি একটি উপসাগর এবং অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার।

ক. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কী?
খ. জাপানকে সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. মানচিত্র অঙ্কন করে তানিশার দেখা জলরাশির অবস্থান চিহ্নিত কর।
ঘ. তানিশার বাবা উপসাগরটিকে অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়-ছয়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

পাঠ- ১ : অর্থনৈতিক জীবনধারা

কোনো সমাজ বা জনগোষ্ঠী সাধারণত যে-ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করে জীবন ধারণ করে তাকেই ঐ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারা বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। জীবিকার জন্য তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল। জমিতে চাষ করে তারা শস্য উৎপাদন করেন। তা দিয়ে নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মেটান। উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ তারা বাজারে বিক্রি করে সেই অর্থে সংসারের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করেন। বাড়তি শস্য উৎপাদন করে তারা দেশবাসীর খাদ্যের যোগান দেন। এভাবে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। একইভাবে শহরাঞ্চলের শ্রমিক, শিল্পপতি, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক জীবনধারাও শিল্প কিংবা ব্যবসাকেন্দ্রিক।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদেশে ৬০ হাজারেরও বেশি গ্রাম আছে। আর গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এমনকি যাদের নিজস্ব জমি নেই তারাও অন্যের জমিতে কাজ করে জীবন নির্বাহ করে। অর্থাৎ দেশের কয়েক কোটি মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সে কারণে বাংলাদেশকে কৃষিনির্ভর দেশ বলা হয়। কৃষিকাজ ছাড়াও গ্রামের মানুষের একটা অংশ জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, মুদি হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু কিছু লোক গ্রামের হাট-বাজার বা কাছাকাছি শহরে-গঞ্জে ছোটখাটো ব্যবসা করে। এদের সবাইকে নিয়েই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রয়েছে।

চিত্র ৬.১ : কুমোর মাটির পাতিল তৈরি করছে

আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও এক সময় কৃষি ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সার, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল বীজের প্রয়োগ হচ্ছে। এর ফলে ফসলের উৎপাদনই শুধু বাড়েনি, গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও তা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর এর প্রভাব পড়ছে।

চিত্র ৬.২ : জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরছে

চিত্র ৬.৩ : তাঁতি কাপড় বুনছে

গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব

আমাদের দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশ আসে কৃষি থেকে। আর গ্রামের মানুষই এর উৎপাদক। কোনো কারণে এক বছর দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে সে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। নতুবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। দেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎসও হচ্ছে গ্রামীণ কৃষিখাত। অর্থাৎ দেশের শিল্প–বাণিজ্য ও জনগণের কর্মসংস্থানের বিষয়টি অনেকাংশে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এখনও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

চিত্র ৬.৪ : গ্রামের একটি হাট

চিত্র ৬.৫ : শহরের গার্মেন্টস কারখানা

শহরের অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করে। রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় বাস করে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এসব শহর ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে বসবাসকারী মানুষ সাধারণত অফিস-আদালত ও শিল্প-কারখানায় চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন চালনা, নানা ধরনের দিনমজুরি ও বাসাবাড়িতে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ধনী তারা নগরীর অভিজাত এলাকায় বাস করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব বা ভাড়া বাসায় থাকে। এছাড়া বিশালসংখ্যক মানুষ বস্তি এলাকায় বাস করে। বড় বড় শহরগুলোতে ভাসমান মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তারা অস্থায়ীভাবে ফুটপাত, পার্ক, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট ইত্যাদিতে রাত কাটায়। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকেও কোনো না কোনো জীবিকা অবলম্বন করতে হয়। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক, দিনমজুর, বস্তিবাসী সবাই মিলেই শহরের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখে।

শহুরে অর্থনীতির গুরুত্ব

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে আজ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবনধারার পার্থক্য কিছুটা কমে আসছে। বাড়ছে গ্রাম ও শহরের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা। লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শহরের উপর নির্ভরশীল। নগর জীবনের বিস্তার, শিল্পায়ন ও কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহুলোক শহরে আসে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শহুরে জনগণের ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কাজ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজের গুরুত্ব আলোচনা কর। এ কাজটি মৌখিকভাবে প্রশ্ন- উত্তরের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

পাঠ– ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ

পৃথিবীর অন্য যে–কোনো দেশের মতো আমাদের অর্থনীতিরও প্রধান খাতগুলো হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা–বাণিজ্য ও সেবাখাত। তবে এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

ক. কৃষি : প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের অর্থনীতিতে কৃষি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান, পাট, চা, ডাল, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন; বনজ সম্পদ, পশুপালন ও মৎস্যচাষকে কৃষিখাতের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ২০ শতাংশেরও বেশি।

খ. শিল্প : কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খনিজ সম্পদ দালানকোঠা বা অবকাঠামো নির্মাণ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পসামগ্রী হলো পাট ও চামড়াজাত দ্রব্য, সুতা ও কাপড়। এছাড়া রয়েছে কাগজ, পোশাক, আসবাবপত্র, চিনি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য, পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। যে–দেশ যত উন্নত তার অর্থনীতিতে শিল্পখাতের ভূমিকা তত গুরুত্বপূর্ণ।

গ. ব্যবসা–বাণিজ্য : অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যও আমাদের অর্থনীতির একটি প্রধান খাত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে দেশের ভিতরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জিনিসপত্র কেনাবেচাকে বুঝায়। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে আমরা যেমন কিছু পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করি, তেমনি যেসব পণ্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার একটি অংশ বিদেশে রপ্তানিও করি। এভাবে রপ্তানিকৃত পণ্য থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

ঘ. সেবাখাত : যে–কোনো দেশের অর্থনীতিতে সেবাখাত একটি বড় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক–বীমা, জনপ্রশাসন, আইন–শৃঙ্খলা বাহিনী এগুলো হলো সেবাখাতের উদাহরণ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই এই খাতটি পরিচালিত হয়। যে–দেশ যত উন্নত এবং জনগণের কল্যাণকে যত বেশি গুরুত্ব দেয়, সেখানে এই সেবাখাতটি ততই শক্তিশালী।

অর্থনৈতিক খাতসমূহের অবদান

আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও সেবা এই খাতগুলোর কোনোটির গুরুত্ব অন্যটির চেয়ে কম নয়। কৃষিখাত দেশের মানুষের খাদ্য–চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। শিল্পখাত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, আবাসন প্রভৃতির চাহিদা মেটানো ছাড়াও নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যবসাখাত অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য–সামগ্রীকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। সেবাখাত দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য কাজ করে। আজকের বিশ্বে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হলেও, কৃষিখাতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। বর্তমানে খুব প্রয়োজনের সময়ও বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। খাদ্যশস্যের দামও খুব চড়া। এ অবস্থায় আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার জন্য আমাদেরকে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি অর্থনীতিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে আমরা কৃষি উৎপাদনকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারি। সরকারও কৃষকদের ভর্তুকি মূল্যে সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করছে। দেশে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে এসব কৃষি উপকরণ আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা মানুষের

জীবনযাত্রা ও সচেতনতার মান বাড়িয়ে তুলতে পারলে জাতীয় অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়বে। দক্ষ জনশক্তির অভাব পূরণ হবে। জনসংখ্যাকে প্রকৃত জনসম্পদে পরিণত করা যাবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের লাখ লাখ লোক মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে চাকরি এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যও করছে। তাদের অর্জিত অর্থ তারা নিয়মিত দেশে পাঠাচ্ছে। প্রবাসীদের পাঠানো এই অর্থ কেবল তাদের পরিবার-পরিজনেরই ভাগ্য ফেরাচ্ছে না আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নেও বিরাট অবদান রাখছে।

কাজ- ১ : বাংলাদেশের সেবা খাতের একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ- ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গুরুত্ব তুলে ধর। দলগতভাবে কাজটি করবে।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার পর অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যসব উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও উন্নয়নের পথে কতগুলো বাধা বা সমস্যা রয়েছে। যেমন জনগণের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। অন্যদিকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের চমৎকার সম্ভাবনাও আছে। যার মধ্যে প্রধান হলো আমাদের বিরাট জনশক্তি ও উর্বর ভূমি। উন্নয়নের পথে আমাদের সমস্যাগুলোকে ঠিকভাবে চিনে তা দূর করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্য-আয়ের দেশগুলোর একটিতে পরিণত হবে। কোনো খনিজ বা প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও কেবল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পৃথিবীর অনেক দেশ উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে- যেমন সিঙ্গাপুর। সেদিক থেকে আমরা অনেক ভাগ্যবান। আমাদের মাটি, পানি ও বিরাট জনশক্তি উন্নয়নের পথে একটি বড় সহায়। আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রমী। আমাদের দেশের প্রবাসী শ্রমিকেরা বিদেশের মাটিতে তার প্রমাণ দিচ্ছে। গার্মেন্টস বা পোশাক-শিল্পে বাংলাদেশ যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাও উন্নয়নের পথে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে।

উন্নয়নের পথ

ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা

জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে তার জন্য দরকার শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। বিশাল জনসংখ্যার দেশ আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের শিক্ষার হার খুব কম। শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। দেশের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা তাদের জীবনমান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে পারি। সেই সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের বিরাট জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি।

খ. কৃষির উন্নতি

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি এখনও উন্নয়নের প্রধান খাত। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ-ফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের দ্বারা আমরা আমাদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারি। এতে আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

কয়লা, গ্যাস, তেল প্রভৃতি যে-সব প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও আমাদের দেশে অব্যবহৃত রয়েছে তা উত্তোলন ও ব্যবহার করতে হবে। এতে আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নের গতি বাড়বে।

ঘ. শিল্পের প্রসার

গার্মেন্টস, ঔষধ, সিমেন্ট, সিরামিকসহ দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতকে সম্প্রসারণ করতে হবে। যাতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য আমরা আরও অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। তাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বাড়বে ও অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

ঙ. অবকাঠামো নির্মাণ

সড়ক, সেতু, রেলপথ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বা সম্প্রসারণ করতে হবে। তা না হলে শিল্প বা কৃষি, বাণিজ্য বা সেবা কোনো ক্ষেত্রেই একটি দেশ উন্নতি করতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত হিসেবে এই অবকাঠামো নির্মাণের ব্যাপারটিকে তাই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

চ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নীতি ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। যাঁরা পরিকল্পনা করবেন ও যাঁরা তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন তাঁদের সবাইকে এ ব্যাপারে দেশের স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করে মৌখিকভাবে কাজটি উপস্থাপন করা যায়।

পাঠ-৪ : উন্নয়নের পূর্বশর্ত : দক্ষ জনশক্তি

মানবসম্পদ

অদক্ষ মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো কাজে আসে না। অন্যদিকে দক্ষ মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে সফল হয়, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও গতিশীল করতে পারে। দক্ষ মানুষ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে অদক্ষ মানুষ গণ্য হয় রাষ্ট্রের বোঝা হিসেবে। দক্ষ মানুষকেই মানবসম্পদ বলা হয়। কেননা এ ধরনের মানুষ তার দক্ষতা দিয়ে সম্পদ আহরণ বা উৎপাদন করতে পারে। এটিই হচ্ছে মানুষের

উৎপাদনশীলতা। ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে দেশ তত বেশি উৎপাদনশীল হবে। মানব-সম্পদ ও অদক্ষ জনশক্তির একটি তুলনা নিচে দেওয়া হলো।

চীন দেশে ১৩৫ কোটি মানুষ বাস করে। চীনে প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে চীনের প্রতিটি মানুষ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে। চীনারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় চীনের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

জনগণ কোনো দেশের জন্য সম্পদ না হয়ে সমস্যা হতে পারে এমন উদাহরণও পৃথিবীতে রয়েছে। যেমন আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশ ভৌগোলিকভাবে বেশ বড়, তাদের জনসংখ্যাও খুব বেশি নয়। তারপরও দেশগুলো দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। যেমন মালি, শাদ, সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, নাইজার প্রভৃতি।

জনসমষ্টিকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়

মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

ক. মানসম্পন্ন প্রাথমিকশিক্ষা ও কর্মমুখীশিক্ষা প্রদান,
খ. প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগে সহায়তাদান,
গ. পেশাগত প্রশিক্ষণ দান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান,
ঘ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান,
ঙ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে মূলধন খাটানোর কৌশল শিক্ষাদান,
চ. উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা,
ছ. উন্নত স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান,
জ. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা ঠিকভাবে কার্যকর করা গেলে দেশের শতভাগ মানুষ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে আর শতভাগ দক্ষ জনশক্তি নিয়ে কোনো দেশ দরিদ্র থাকতে পারে না। সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

মানবসম্পদ সৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও জনগণের ভূমিকা

মানুষ আপনা-আপনি জনসম্পদে পরিণত হতে পারে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটি বড় ভূমিকা আছে। রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করলে জনগণকে তা কাজে লাগাতে এগিয়ে আসতে হবে।

ক. রাষ্ট্রের ভূমিকা

জনগণকে মানবসম্পদে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকাটি আসলে রাষ্ট্রকেই নিতে হয়। আধুনিক যুগে যে-সব রাষ্ট্র জনগণের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের দায়িত্ব পালন করেছে সে-সব রাষ্ট্রের জনগণ দ্রুত মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে সেসব দেশ দ্রুত উন্নতিও লাভ করেছে। যে-সব রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে সেসব রাষ্ট্রের জনগণ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তারা জীবনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সংবিধানে জনগণের উক্ত পাঁচটি মৌলিক

অধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিজেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করতে প্রচেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছে

খ. জনগণের ভূমিকা

আমাদের সম্পদ সীমিত। তাই রাষ্ট্রের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ সকল চাহিদা পূরণ করা কঠিন। তবে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও জনগণের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্র নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। জনগণকে এসব সুযোগ–সুবিধার সদ্ব্যবহার করে নিজেদেরকে মানবসম্পদ রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে

কাজ : জনগণকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎস কোনটি?

ক. কৃষিখাত গ. আমদানিখাত
খ. শিল্পখাত ঘ. সেবাখাত

২. শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখে –

i. ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী
ii. চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত ও পেশাজীবী
iii. নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও দিনমজুর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও iii
খ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সিরাজগঞ্জের সবজি চাষি বিমল মিত্র তার উৎপাদিত কাঁচা সবজি গ্রামেই বিক্রি করত। গ্রামে তেমন চাহিদা না থাকায় কমদামে বিক্রি করতে হতো। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর এখন সে প্রতিদিন ঢাকায় এসে সবজি বিক্রি করায় তার আয় তিনগুণ বেড়ে যায়।

৩. বিমল মিত্রের আয় বৃদ্ধির মূল কারণ কী –

ক. অবকাঠামোগত নির্মাণ গ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
খ. কৃষির আধুনিকীকরণ ঘ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৪. উক্ত নির্মাণের ফলে সংগঠিত হচ্ছে–

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ii. শিল্পের প্রসার
iii. বাজার সম্প্রসারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আশরাফ আলী তার কারখানায় পশুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ তৈরি করেন। প্রথম বছরে ইংল্যান্ডে তার তৈরি ব্যাগ স্বল্প পরিমাণে বিক্রি হলেও তিন বছর শেষে ইউরোপের কয়েকটি দেশে তার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে তার স্ত্রী মিসেস জমিলা প্রতিদিন বাড়ির আঙিনার খামার থেকে প্রায় শতাধিক ডিম বাজারে বিক্রি করেন। দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের সুখের সংসার।

ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ শহরাঞ্চলে বাস করে?
খ. বাংলাদেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয় কেন?
গ. মিসেস জমিলার কাজটি অর্থনীতির কোন খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আশরাফ আলী ও মিসেস জমিলার কাজের মধ্যে কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক সহায়ক বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. মধ্যবিত্ত লোকমান সাহেবের চার ছেলের সবাই বেকার। বড় ছেলে আরমানকে ধার দেনা করে সৌদি আরব পাঠানোর পর সে একটি খেজুর বাগানে কাজ পেল। সেখানে মরুভূমির অনুর্বর জমিতে মেধা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে খেজুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়। নিজ দেশের অনুন্নত কৃষির কথা চিন্তা করে পরের বছরই সে দেশে ফিরে এসে তিন ভাইকে নিয়ে খামার করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেকার তিন ভাইকে হর্টিকালচার সেন্টার থেকে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চার ভাই একত্রে একটি খামার তৈরি করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

ক. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কত শতাংশ?
খ. সেবাখাত বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. জনাব আরমান সৌদি আরব থেকে ফিরে কোন অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "জনাব লোকমানের বেকার চার পুত্রই এখন মানবসম্পদ"– মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়-সাত

শিশুর অধিকার

পাঠ- ১ : মানবাধিকার নিয়ে কিছু কথা

মানুষ জন্ম থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে। এগুলোকে মানবাধিকার বলে। এগুলো না থাকলে মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। মানুষ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নিয়েই জন্মায়। কোনো রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোনো শক্তি তাকে এগুলো দেয় না। তারা বরং সময় সময় এগুলো হরণ করে নেয়। যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশু বয়স থেকেই মানুষকে তার এই যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। তার জন্য আমাদেরকে শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

মানবাধিকার বলতে আমরা বুঝি এক গুচ্ছ অধিকার যা মানুষের স্বাধীনতা এবং মর্যাদার জন্য অপরিহার্য।

শিশুরা মানুষ হিসেবে মানবাধিকারের অংশিদার। তবে শিশুরা কোমল এবং বিকাশমান বলে তাদের অধিকারকে আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকারের ধারণায়। শিশু অধিকারের মর্মকথা হচ্ছে শিশুরা যেন সুন্দর ও সুস্থভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে, তারা যেন অংশ নিতে পারে জ্ঞান-অর্জনে। শিশুরা যেন তাদের জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে। শিশু অধিকারের আর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে তারা যেন নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

অধিকার আসলে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা—কথা বলার, চলাচলের, মত প্রকাশের যে অধিকার সেগুলো মানুষকে স্বাধীনতা দেয়। ভাবনাচিন্তা আর বিচার-বিবেচনা করে তোমরা যে কথাটা বলতে চাইছ সেটা বলার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। এই স্বাধীনতা তোমাদের ক্ষমতাও বাড়ায়।

অধিকার নিরাপত্তার অবলম্বন— সেই মানুষই যথার্থ স্বাধীন, যার জীবন ভয়ে বা নিরাপত্তাহীনতায় কাটে না; যার জীবন সবদিক থেকে নিরাপদ ও বাধাহীন।

প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাঁচটি অধিকার দাবি করতে পারে : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এগুলো একজন মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবার এগুলো তার মৌলিক অধিকারও। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা।

দেশের সব নাগরিকের জন্য এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা খুব সহজ কাজ নয়। সুস্থ-সবল মানুষকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যাবে না। তার তো খাবার কেনার সামর্থ্য থাকতে হবে। আবার সে খাবারে কেবল পেট ভরলেও চলবে না, মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাবার হতে হবে। খাবার কেনার সামর্থ্য মানে আয় বা রোজগারের সুযোগ। বেকার মানুষ নিজের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা কোনো কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারবে না। তাই মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করাও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব মানুষের স্বাধীনতা আর অধিকার ভোগের পথে বড় বাধা।

কাজ : অধিকার নিয়ে ক্লাসে একটি মুক্ত আলোচনার আসর কর।

পাঠ– ২ : শিশুর অধিকার

শিশুর জীবন অনেক ব্যাপারে বড়দের উপর নির্ভরশীল। তার নিজের আয় নেই। ছোট বলে তার গায়ে শক্তি কম। একই কারণে তার জ্ঞানও কম। কিন্তু তাই বলে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তার উপর কোনো ব্যাপারে জোর খাটানো চলবে না। শিশুও কতগুলো ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। শিশু হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তারও কিছু অধিকার আছে। জাতিসংঘ বড়দের মতো শিশুদের জন্যও কতগুলো সুনির্দিষ্ট অধিকার ঘোষণা করেছে। ১৯৮৯ সনের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে এই অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা আছে। সেগুলো বিশ্লেষণ করে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে যে কথাগুলো ছোটবড় সবার জানা দরকার তা হলো–

- ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। তবে কোনো কোনো দেশে এ বয়স দেশীয় আইনে আরও কম।
- সব শিশুর অধিকার সমান। অর্থাৎ ছেলেমেয়ে, ধনী–গরিব, জাতীয়তা, ধর্ম, শারীরিক সামর্থ্য কোনো কিছুতেই শিশুদের অধিকারের তারতম্য করা যাবে না।
- বাবা–মা ও বড়দের শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকেই তাদের সদুপদেশ দিতে ও পথ চলতে সাহায্য করতে হবে।
- শিশু তার নিজের ও বাবা–মার নামসহ সঠিক পরিচয় ব্যবহারের অধিকারী হবে।
- শিশুর বেঁচে থাকা ও বড় হওয়ার অধিকার রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
- মা–বাবার নির্দেশনায় শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রকাশ, বিবেক–বুদ্ধির বিকাশ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।
- মারধর কিংবা অন্যায় বকাঝকা থেকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব আছে।
- শিশুরা যাতে সময়মতো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পায় রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষাচর্চার অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- প্রতিটি শিশুর অবকাশ যাপন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অধিকার রয়েছে।
- অর্থনৈতিক শোষণ এবং যে–কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুর বিরত থাকার অধিকার রক্ষা করতে হবে।
- শিশুকে কেউ যেন অন্যায় কাজে ব্যবহার করতে না পারে। শিশুর শারীরিক–মানসিক–নৈতিক ক্ষতি যাতে না হয় রাষ্ট্রকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কোনো শিশুকে যুদ্ধে বা সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না।
- শিশুর সম্মানবোধ, নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

এই অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্যও অনেকগুলো বিধান রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা প্রধান হলেও বাবা–মার দায়িত্বও কিন্তু কম নয়। মোটকথা শিশুর জীবনধারণ, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিন্তা, বিবেচনা, মত প্রকাশ ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি তার যত রকম অধিকার আছে সব রক্ষা করার দায়িত্ব তাকে ঘিরে থাকা বড়দের।

কাজ : শিশুর অধিকারের তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে কয়টি ধারা রয়েছে?

ক. ৫২ গ. ৫৪
খ. ৫৩ ঘ. ৫৫

২. সেই ব্যক্তি স্বাধীন যার মনে কোনো ভয় থাকে না', কথাটির অর্থ হচ্ছে —

i. যে কাউকে ভয় পায় না
ii. যে খুব বেশি সাহসী
iii. যার জীবন নিশ্চিত ও নিরাপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii
খ. iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও–

মনোয়ারা রাস্তায় ফুল বিক্রি করে। তার গায়ে ছেড়া জামা। সে স্কুলে যায় না। তার ছোট বোনও স্কুলে যায় না। তাদের বাবা নেই। মা অন্যের বাসায় কাজ করে। তার রোজগারে সংসার চলে। এতে তারা পেট ভরে খেতে পায় না।

৩. মনোয়ারার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা হচ্ছে –

i. অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি
ii. অবকাশ যাপন ও খেলাধুলা
iii. শিশুর বেঁচে থাকা ও বড় হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. iii
খ. ii ঘ. i, ii ও iii

৪. মনোয়ারার যে অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে তা রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব কার–

ক. সমাজের গ. পরিবারের
খ. রাষ্ট্রের ঘ. প্রতিবেশীর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

চিত্র : শিশুটি ইট ভাঙছে

ক. অধিকারের অর্থ কী?
খ. মৌলিক মানবিক অধিকার বলতে কী বুঝায়?
গ. চিত্রে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের কোন ধারাটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চিত্রে শিশুদের এই দুরবস্থার জন্য তুমি কি পরিবারকেই দায়ী বলে মনে কর? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. রিফাহ্ ও রিমা দুই বোন। কাগজ দিয়ে তারা রোবট বানানোর চেষ্টা করছিল। তাদের মা দেখে ধমক দেন এবং জিনিসপত্রগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেন। ঠিক তখনই টিভিতে শিশু অধিকার নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান চলছিল, যা দেখে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন।

ক. শিশু কার?
খ. 'অধিকার নিরাপত্তার অবলম্বন'– বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।
গ. রিফাহ্র মা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের কোন ধারাটি লঙ্ঘন করেছেন–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রিফাহ্র মা এর করণীয় কী ছিল, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও।

অধ্যায়-আট

সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ

পাঠ–১ : আঞ্চলিক সহযোগিতা

আজকের বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন উন্নতি ঘটেছে যে এই গ্রহকে বলা হচ্ছে বৈশ্বিক গ্রাম, ইংরেজিতে 'গ্লোবাল ভিলেজ'। আজকের দিনে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের খুব সহজেই ও দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব। ব্যবসা–বাণিজ্যেও সব দেশকেই মুক্ত প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় মুক্তবাজার অর্থনীতি বা Open Market Economy। অর্থনীতির মতো সামরিক ব্যাপারেও এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। আবার ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেও এক দেশকে আরেক দেশের উপর কমবেশি নির্ভর করতে হয়। যেমন যে–দেশকে চারিদিকেই ঘিরে আছে অন্যান্য দেশ, সমুদ্রের সাথে তার নিজস্ব সংযোগের উপায় নেই, সে দেশকে বন্দরের সুবিধার জন্য প্রতিবেশী দেশের উপর নির্ভর করতে হয়।

আসিয়ান ও সার্ক

অবস্থানগত সুবিধার ভিত্তিতে পৃথিবীতে অনেকগুলো আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো মিলে গঠন করেছে আসিয়ান (ASEAN)। সংস্থাটির পুরো নাম 'এসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস'। বাংলায় বলা যায় দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা। এর সদস্যদের মধ্যে আছে ইন্দোনেশিয়া,মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, লাওস প্রভৃতি। আসিয়ানের সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে গঠন করেছে সার্ক (SAARC)। পুরো নাম 'সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো–অপারেশন'। বাংলায় বলা যায় আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ এশীয় সমিতি। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা হলেও, এর কর্মক্ষেত্র সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। বাংলাদেশ ছাড়া সার্কের অন্যান্য সদস্য দেশগুলো হলো ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান ও আফগানিস্তান। এছাড়া বর্তমানে মিয়ানমার পর্যবেক্ষক হিসেবে এ সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

উন্নত বিশ্বের সহযোগিতা সংস্থা

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রথমে গঠন করেছিল কমন মার্কেট। তারপর এর অংগতা বেড়ে হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)। ইউরোপের প্রায় সব দেশই এর সদস্য। ইইউ তার নিজস্ব মুদ্রাও চালু করেছে, যার নাম 'ইউরো'। ইউরোপের সব দেশেই তাদের দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি এই ইউরোও চলে। সদস্য দেশগুলোর নাগরিকরা আজ অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত, বসবাস, ব্যবসা–বাণিজ্য করতে পারে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্–এ অবস্থিত।

পৃথিবীর ধনী, শিল্পোন্নত ও প্রভাবশালী দেশগুলো মিলে গঠন করেছে 'জি–এইট' গ্রুপ। আট সদস্যের এই সংস্থায় আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা, ইটালি ও রাশিয়া। এই গ্রুপ কেবল নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাই করে না। আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। তাছাড়া পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অভিশাপমুক্ত পৃথিবী গড়ার বিষয়ে তাদের করণীয় নিয়েও আলোচনা ও নিজস্ব কর্মকৌশল নির্ধারণ করে জি–এইট।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও এ রকম আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আছে। আজকের দিনে সকল দেশেই মানুষ চায় উন্নত জীবনযাপন করতে। সব দেশই উন্নয়নের বড় রকম সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। এ ব্যাপারে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাগুলো ছাড়াও দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি, সম্প্রীতি রক্ষা এবং সমৃদ্ধির পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নানারকম সংস্থা কাজ করছে। যেমন আরব দেশগুলোর সংগঠন আরব লীগ, মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি বা অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কো–অপারেশন, অত্যন্ত সক্রিয় দুটি সংগঠন। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ। কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় সারা বিশ্বের এমন দেশগুলোর সংগঠন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)। আফ্রিকার দেশগুলো মিলে গড়ে তুলেছে ওএইউ (OAU) বা 'অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি', বাংলায় আফ্রিকান ঐক্যসংস্থা।

এছাড়া দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে করা হয় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি। বর্তমানে এ ধরনের চুক্তি বেড়েই চলেছে। কারণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো এই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি।

পাঠ–২ : সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, ব্যাধি ও পরিবেশ বিপর্যয় মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার জন্য ২০০০ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে ঘোষিত হয়েছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Millenium Development Goals (MDG)। এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আটটি ক্ষেত্রকে এই সহযোগিতার জন্য চিহ্নিত করে কাজ শুরু হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো :

১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি,

২. সার্বজনীন প্রাথমিকশিক্ষা নিশ্চিত করা,

৩. সর্বক্ষেত্রে নারী–পুরুষে সমতা এনে নারীর ক্ষমতায়ন,

৪. শিশুমৃত্যুর হার কমানো,

৫. সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু রোধ ও মায়ের স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা,

৬. মারাত্মক ব্যাধিকে নির্মূল করা,

৭. টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা ও

৮. উন্নয়নের ক্ষেত্রে সব দেশের অংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ ঘোষণায় ২০১৫ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য দেশের মতো বাংলাদেশও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতের পরেই বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাই দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্য অর্জনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ। এর জন্য দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ করে কাজও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সবার জন্য প্রাথমিকশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানোর মতো কাজে বাংলাদেশ এর মধ্যেই বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষা, টিকাদান কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, দরিদ্রদের সহায়তা দানেও বাংলাদেশের অর্জন সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। নানা সমস্যার মধ্যেও বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কাজ– ১ : এশিয়ার মানচিত্রে আসিয়ান ও সার্কভুক্ত দেশগুলো দেখাও

কাজ– ২ : সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নিয়ে দলে ভাগ হয়ে আলোচনা কর এবং বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে নিজের ধারণা লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্কের মূল লক্ষ্য কী?

ক. সামাজিক সহযোগিতা
খ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা
গ. সাংস্কৃতিক সহযোগিতা
ঘ. শিক্ষা সহযোগিতা

২. বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের দ্রুত উন্নতি সাধিত হওয়ায় কোন অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছে?

ক. মুক্ত বাজার
খ. বদ্ধ বাজার
গ. কেন্দ্রীভূত বাজার
ঘ. বিকেন্দ্রীভূত বাজার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

পোশাক শিল্পের মালিক রহমান সাহেব সকালে ই-মেইলে দেখলেন তার কোম্পানির পোশাকের নমুনা তিনটি দেশে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দেশ তিনটি তার কোম্পানির পোশাক কিনতে আগ্রহী। অফিস সহকারী লোকমান অফিসে বসেই তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে পোশাক রপ্তানির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

৩. কোন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে রহমান সাহেব অফিসে বসেই বিদেশে পোশাক রপ্তানির সুযোগ পেলেন?

ক. যাতায়াত
খ. যোগাযোগ
গ. বাণিজ্যিক
ঘ. অর্থনৈতিক

৪. উক্ত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে –

i. মুক্ত বাজার অর্থনীতি
ii. বাণিজ্য প্রতিযোগিতা
iii. বাণিজ্য সম্প্রসারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাহাত নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া এলাকার বাসিন্দা। সে তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে গাছের চারা ক্রয় করে। চারাগুলো তারা রাস্তার দুপাশে রোপণ করে। এছাড়া তারা এলাকার মজা পুকুরটি পরিষ্কার করে মাছের চাষ করে। অন্যদিকে ফাহাদ বেসরকারি একটি সংস্থার সহায়তায় সকল শিশুকে টিকা দেওয়ার জন্য তার এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতি বাড়িতে গিয়ে সকল শিশুর স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য মায়েদেরকে পরামর্শ দেয়।

ক. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
খ. দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর
গ. রাহাত ও তার বন্ধুদের কাজের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়নের যে লক্ষ্য অর্জিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ফাহাদের কাজটি কি বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. রাহাতের নেপালি বন্ধু গোমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাহাত বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে নেপালের শিল্পকলা একাডেমীতে গান পরিবেশন করেন। রাহাত নেপালে অবস্থান কালে গোমেজের বাড়িতে বেড়াতে যায়।

ক. আসিয়ানের পূর্ণরূপ কী?
খ. মুক্তবাজার অর্থনীতি কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. নেপালে গিয়ে রাহাতের গান পরিবেশন করা সার্কের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত কাজটি ছাড়াও সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে কাজ করে – বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৬ শিক্ষাবর্ষ

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য